RB
B
340.59
AKN

Dhaka University Institutional Repository

446934

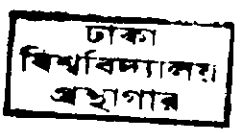

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

রহিমা আক্তার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

জানুয়ারী-২০০৯

গবেষক
রহিমা আক্তার
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে রহিমা আক্তারের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্যে লিখিত ও পরীক্ষার জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ "নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতঃপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য এই আভসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

ঢাকা
জানুয়ারী,২০০৯।

রহিমা আক্তার
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ-২০০১-২০০২
রেজিঃ -৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"-গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের নির্যাতনের দু:খ আর যন্ত্রনাকে কেন্দ্র করে। এই সকল নির্যাতিত নারী ও শিশুদের যন্ত্রনা, দু:খ, কষ্টকে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণায় তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করে তোলা এবং নিরসন করাই আমার গবেষণার লক্ষ্য। আর তাই আমি এই গবেষণায় খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি নির্যাতনের স্বরূপ, সংখ্যা এবং প্রতিকারের সম্ভাব্য উপায়সমূহকে। এই গবেষণার মাধ্যমে আমি যদি কোন সঠিক আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারি তবে তা হবে এই সকল নারী ও শিশুদের যন্ত্রনা ও কষ্টের অর্জিত ফসল। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে বাংলাদেশব্যাপী বিভিন্ন আইন সহায়তা শাখা ও কেন্দ্রসমূহে আগত নারী ও শিশুদের স্মরণ করছি।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে যিনি আমার গবেষণাকর্মের সঠিক তত্ত্বাবধান ঃ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা রীতি বুঝিয়ে দেয়া সহ অভিসন্দর্ভ রচনায় তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে পরামর্শদান ও সহযোগিতা করেছেন আমার জন্য।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দকে (সঙ্গত কারণেই তাদের নাম উল্লেখ করছিনা) যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভান্ডারের আলোকে আমাদেরকেও আলোকিত করেছেন। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহিলা অধিদপ্তরের প্রধান মোঃ কুদ্দুস খান যিনি আমাকে তাদের বিশাল লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি women for women, মহিলা আইনজীবি সমিতির সদস্যবৃন্দকে যারা আমার গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সাহায্যকারী সকল বন্ধু ও আত্মীয়দের যারা আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু প্রতিম স্বামী মোঃ কামাল হোসেন ভূঁইয়াকে ও আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, শাশুড়ীকে যারা শত ব্যস্ততার মাঝে আমার অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব আর সন্তানের দেখাশোনা সামাল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এই মূল্যবান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার মা, বাবা সহোদর এবং সহোদরাদের যারা আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার অবর্তমানে দায়িত্ব কিছু হলেও নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সন্তান মোঃ যুবায়ের হোসেন ভূঁইয়াকে, দীর্ঘ ১ বছর আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েও আমার এই মহান কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য।

পরিশেষে পরম করুনাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যিনি আমাকে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনায় তৌফিক দিয়েছেন।

রহিমা আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

CIDAW	Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.
DEVAW	Declaration on Elimination of Violence Against Women.
BNWLA	Bangladesh National Women Lawer Association.
PFA	Platform For Action.
N.B.W.R.P	National Board of Women's Rehabilitation Programme.
O.C.C	Onestop Crisis Centre.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

পৃষ্ঠা

সারণী-১ঃ ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র ১৬

সারণী-২ঃ বিগত ৫ বৎসরের BNWLA কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র ১৯

সারণী-৩ঃ মে ১৯৯৯- মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এসিড আক্রান্তের সংখ্যা ২২

সারণী-৪ঃ ঢা.বি.র ছাত্র-ছাত্রীদের মতানুসারে যৌন হয়রানীর কারণ সমূহের পৌনঃপুনের শতকরা হার ৩৫

সারণী-৫ঃ বয়স অনুসারে মহিলাদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও শতকরা হার ৬১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই সকল প্রশংসা যিনি করুণাময়, ক্ষমাশীল। যিনি আশরাফুল মাখলূকাত হিসেবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম রাহমাতুল্লীল আলামীন, নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে যিনি সত্য দ্বীন সহ সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য আবিভূর্ত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সৃষ্টি নারী। পৃথিবীর উন্নতির পথে যদি পুরুষের ভূমিকা থেকে থাকে তবে নারীর ভূমিকাও কোন অংশেই কম নয়, অথচ তা যুগ যুগ ধরে অবমাননা করে আসা হয়েছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে নারীকে অনন্য মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে সমঅধিকার। এমন অধিকার যা মানলে পৃথিবী একটি সুখের স্বর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ মানুষ দিন দিন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজকে কলুষিত করছে আর পাপের বোঝা বাড়াচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে মানব শিশু অন্যতম। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ফসল। সন্তান মানবজাতির সকল সময়ের সম্পদ। এ সম্পদের সুফল মৃত্যুর পরও ভোগ করা যায়। শিশুরা তাই পার্থিব জগতের হাসি আর আনন্দের নিরন্তন উৎস। আজকের ছোট্ট শিশু আগামী দিনের আশা ভরসার প্রতীক। সপ্নীল সকালের সোনালী সূর্য। তাই তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উপর জাতির কল্যাণ নির্ভরশীল। বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির কাছে শিশু অধিকার সর্বজন স্বীকৃত।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামে শিশু অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। অন্ধকারযুগে আরব দেশে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বর্তমানেও শিশুদেরকে মানুষ নানা বর্বর কাজে নিয়োজিত করছে যেমন তাদেরকে পাচার, হত্যা, শারীরিক নির্যাতন করছে, এ ধরনের অমানবিক কাজকে ইসলাম কাঠোরভাবে নিন্দা ও নিষিদ্ধ করেছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে এর সুন্দর সমাধান দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে **ছয়টি** অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **'গবেষণা: উদ্দেশ্য ও পরিচিতি'**। এ অধ্যায়ে সমস্যার বিবরণ, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে **'নারী-শিশু নির্যাতন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। এখানে দেখানো হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত এদেশেও নারী-শিশুরা প্রতিনিয়তই হচ্ছে নিপীড়িত, নির্যাতিত আর নানাবিধ বৈষম্যের শিকার। প্রতিদিন খবরের কাগজে যেসব নির্যাতনের অবর্ননীয় কাহিনী উঠে আসে তাও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। নারী-শিশু নির্যাতনের ধরনগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় ২০০১-২০০৭ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দেশের সামগ্রিক নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন এই তিন শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তবে শ্রেণীভুক্ত আলোচনার গুরুতেই আলোচিত হয়েছে নারী-শিশু নির্যাতনের সার্বিক পর্যালোচনা। সেই সাথে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন নিরসনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, আইন সালিশ কেন্দ্র, উইমেন ফর উইমেন, মহিলা অধিদপ্তর প্রভৃতি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়াও ৯টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত সংবাদ ও নিবন্ধকেও আমাদের গবেষণার পরিধির মধ্যে রাখা হয়েছে। এছাড়াও চার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে নির্যাতনের হার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে **'বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতনের স্বরূপ ও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ'** বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন প্রকার যেমন এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রাণী, ধর্ষণ, হত্যা ও আত্মহত্যা, ভুল ফতোয়া, যৌতুক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। শিশু নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনাও আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও নারী-শিশুর সাংবিধানিক অধিকার, নারী-শিশুর আইনী অধিকার, জাতিসংঘ ও নারী-শিশু অধিকার, সিডও সম্মেলন ও বাংলাদেশ, নাইরোবী সম্মেলন, ভিয়েনা সম্মেলন, বেইজিং সম্মেলন, বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতন রোধে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, নারী বিষয়ক শিক্ষা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ, বেগম রোকেয়া ও তসলিমার নারীবাদঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা, জাতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকার সনদ এবং বিশ্ব শিশু সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্ব ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে **'ইসলামে নারী-শিশু নির্যাতন আইন ও অধিকার'** নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে **'কেস স্টাডি'** রয়েছে যাতে নির্যাতিত কয়েকজন নারী-শিশুর মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে, নির্যাতিত নারী-শিশুর সাক্ষাৎকার নিয়ে তা গবেষকের নিজ ভাষায় এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের কি করণীয় তা **'সুপারিশমালা'** আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার পরপরই **'উপসংহার'** রয়েছে। আর সবশেষে রয়েছে একটি বিস্তারিত **গ্রন্থপঞ্জি**।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতনের বিবরণ এবং বিদ্যমান আইন কানুন উল্লেখ করে এ সত্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, নারী-শিশু নির্যাতন দমন করে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণ করতে হলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি ইসলামী বিধি বিধান বাস্তবায়ন করে চলি তাহলেই কেবল আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে নারী-শিশু নির্যাতন মুক্ত করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়ন পত্র	i
ঘোষণা পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii-iv
শব্দ সংক্ষেপ	v
সারণী তালিকা	vi
ভূমিকা	vii-ix
প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা : উদ্দেশ্য ও পরিচিতি	১
১.১ সমস্যার বিবরণ	৩
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৩ গবেষণার পরিধি	৫
১.৪ গবেষণার পদ্ধতি	৫
১.৪.১ তথ্য সংগ্রহ	৫
১.৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ	৫
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নারী-শিশু নির্যাতন : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৭
২.১ সংজ্ঞা	৭
২.২ বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ধরন	১০
২.২.১ গৃহনির্যাতন	১১
২.২.২ সামাজিক নির্যাতন	১২
২.২.৩ রাষ্ট্রীয় নির্যাতন	১২
২.৩ নির্যাতনের কারণ ও প্রেক্ষাপট	১৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের স্বরূপ ও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ ১৬

৩.১ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বর্ণনা ২১

৩.১.১ এসিড সন্ত্রাস ২১

৩.১.২ যৌন হয়রানী ২৯

৩.১.৩ ধর্ষণ ৫০

৩.১.৪ হত্যা ও আত্মহত্যা ৫৪

৩.১.৫ ভুল ফতোয়া ৬২

৩.১.৬ যৌতুক ৬৬

৩.২ শিশু নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা ৭০

৩.৩ নারী-শিশুর সাংবিধানিক অধিকার ৭০

৩.৪ নারী-শিশুর আইনী অধিকার ৭২

৩.৫ জাতিসংঘ ও নারী অধিকার ৮৪

৩.৫.১ সিডও সম্মেলন ও বাংলাদেশ ৮৪

৩.৫.২ নাইরোবী সম্মেলন ৮৯

৩.৫.৩ ভিয়েনা সম্মেলন ৯২

৩.৫.৪ বেইজিং সম্মেলন ৯৩

৩.৬ বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ৯৪

৩.৬.১ নারী বিষয়ক শিক্ষা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ ৯৬

৩.৬.২ বেগম রোকেয়া ও তসলিমার নারীবাদঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা ৯৭

৩.৭ শিশু অধিকার সনদ ১১০

৩.৭.১ শিশু অধিকার গুচ্ছ ১১০

৩.৭.২ চারটি মূলনীতি ১১১

৩.৭.৩ বিশ্ব শিশু সম্মেলন ১১২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার ১১৩

৪.১ শিশু অধিকার ও ইসলাম ১১৩

৪.১.১ বেঁচে থাকার অধিকার ১১৪

৪.১.২ সুন্দর নামের অধিকার ১১৫

৪.১.৩ লালন পালনের অধিকার ১১৫

৪.১.৪ শিশুর খাদ্যের অধিকার ১১৫

৪.১.৫ সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার ১১৬

৪.১.৬ শিক্ষার অধিকার ১১৬

৪.১.৭ বিনোদনের অধিকার ১১৭

৪.১.৮ চরিত্র গঠনের অধিকার ১১৭

৪.১.৯ শিশুর নিরাপত্তা বিধানের অধিকার ১১৮

৪.১.১০ সুন্দর জীবন গঠনের অধিকার ১১৮

৪.১.১১ শিশুর মতামত প্রকাশের অধিকার ১১৯

৪.২ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১২১

৪.২.১ নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুর'আন ১২১

৪.২.২ নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-হাদীস ১৫৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কেস স্টাডি ১৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সুপারিশমালা ১৭৩

উপসংহার ১৭৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণাঃ উদ্দেশ্য ও পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা : উদ্দেশ্য ও পরিচিতি

কবির কবিতায়, গায়কের গানে, লেখকের লেখনিতে কিংবা ভাস্করের ভাস্কর্যে সর্বদাই স্থান পেয়ে এসেছে নারীর সৌন্দর্যগাঁথা। ইসলামে পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেও নারীকে অনন্য মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পর ও উপমহাদেশের নারীরা বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীরা আজও রয়ে গেছে অবহেলিত, উপেক্ষিত। পদে পদে তাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে দারিদ্র্যের অসম বোঝা আর সামাজিক কুসংস্কারও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নানা শৃংখল। ঘরে বাইরে সর্বত্রই তারা হচ্ছে নানারূপ নির্যাতনের শিকার।

নারী বলতে স্ত্রী, কন্যা, জননী-এ তিনটি রূপকেই বোঝানো হয়ে থাকে। জৈবিকভাবে একটি শিশু স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও জন্মলগ্নে সে জানে না, সে নারী না পুরুষ। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে পরবর্তীতে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয় এবং তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় নানা রকম বিধি নিষেধ। 'মেয়েরা এরকম হবে, আর ছেলেরা ওরকম' এর বাইরে গেলেই সে বিচ্যুত, পরিবার এবং সমাজে, এই ধারণা ঢোকানো হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। সমাজ কর্তৃক আরোপিত এই লিঙ্গ- বিভাজন নারীর জন্য বয়ে এনেছে পদে পদে বঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাস।[১]

সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের পুরুষের সাথে সম-মর্যাদায় বিচরণ করতে একবারই দেখা যায়, তা সমাজ সংগঠনের উষা লগ্নে। তারপর সমাজের ইতিহাস নানা বাঁকে মোড় নিয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন, কিন্তু নারীদের অবস্থা সব সময়ই একই রকম রয়ে গেছে। তারা 'Man's world' বা পুরুষের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মাত্র। তাদের কোনো নিজস্ব পৃথিবী, যার মালিক তারা নিজেরাই, কোনোদিনই তৈরি হয়নি।[২]

১.বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, *বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ২০০৪*, ঢাকাঃ পৃ. ৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আমরা এমনই এক বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে নারীরা শাসিত হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক। পিতৃতন্ত্রে পুরুষরা নারীদের নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষরা নারীদের অধস্তন রূপে দেখে। পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই পুরুষরা ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম ও সমাজের পুরুষরাই অগ্রাধিকারের সুবিধা ভোগ করে। বাংলাদেশ এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেরা ছোট বেলা থেকেই শিখে যায় যে শুধু পুংলিঙ্গ নিয়ে জন্মানোর ফলেই সে কিছু বাড়তি সুযোগ আজীবন পেয়ে যাবে এবং সে এভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবতে শুরু করে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশের আইন,. প্রবাদ, সাহিত্য, ছড়ায়, রূপকথায়, কবিতায়, সিনেমায় ও বিজ্ঞাপনে এই পুরুষ শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েরা মানুষ হতে থাকে ছেলেদের বিপরীত লক্ষণগুলো নিয়ে তাদের শিরায় শিরায় ঢুকে যায় এই বোধ যে, পুরুষের আশ্রয়ে অনুগত থাকাই মেয়েদের আদর্শ, তাদের কোনো ইচ্ছা থাকবে না, পছন্দ থাকবে না, সামাজিক বিধি-নিষেধ পালনের এক যন্ত্রে তাদেরকে পরিণত করা হয়। কারণ তারা 'মানুষ' নয় 'মেয়ে মানুষ'।[৩]

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়ন নির্ভর করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের সমান অংশীদারিত্বের ওপর। তাই সংগত কারণেই সমাজ বা রাষ্ট্রে নারী অধিকারের বিষয়টি এসে পড়ে। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ১৯৭৫ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ যে ঘোষণা দেয় তাতে উল্লেখ করা হয় সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের কথা। আরো উল্লেখ করা হয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তির ক্ষেত্রে পুরুষও মহিলার সম-অধিকার, সম-সুযোগ এবং সম-দায়িত্বের কথা।

The status of women has been defined as the degree of women's access to (and control over) material resources (including food income, land and other form of wealth) and to social resources

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

(including knowledge, power and pressing) within the family, in the community and in the society at large.[৪]

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশুসহ সুবিধা বঞ্চিতদের প্রতি বিশেষ নজরের কথা বলা হলেও নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রতিফলন সমাজে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। সমাজে যে কোন ক্ষেত্রেই নারীরা চরম অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। নারীদের নির্যাতিত হবার ঘটনা শহর, গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্রই বিরাজমান। ঘরে বাইরে সকল ক্ষেত্রেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। এমনকি পুলিশের কাছে সহায়তা চাইতে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হবার ঘটনাও এদেশে ঘটছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে।

বলা হয় আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। কিন্তু এই শিশুরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের এ হার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেড়ে চলেছে নারী ও শিশু সহিংসতার মাত্রা, ঘরে বাইরে নারী-শিশু হচ্ছে হত্যা, ধর্ষণ, এসিড, পাচারসহ নানাবিধ সন্ত্রাসের শিকার। দেশের সংবিধানে নারীর। সম অধিকারের কথা বলা[৫] এবং নারীর প্রতি সহিংসতা দমনে নতুন নতুন আইন করা হলেও প্রচলিত আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে প্রকৃত সন্ত্রাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

১.১ সমস্যার বিবরণঃ

নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়। নারীর যে কোন অধিকার খর্ব করা এবং কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তগর্ত।[৬]

---

৪. উদ্ধৃতিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২৮, ঢাকাঃ গভর্ণম্যান্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯১।

৬. মোঃ আনছার আলী খান, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ ও জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন-২০০০*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০০, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নির্যাতন বলতে শিশুদের উপর দৈহিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সহিংসতার ভয়াবহতা কমাতে সরকার তথা সুশীল সমাজের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথমেই স্থান পেয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ। বিভিন্ন ধরনের নারীও শিশু নির্যাতন দমনে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, সফলতা এবং ব্যর্থতা গুলোকেও এ সঙ্গে তুলে আনা হয়েছে। তাই এ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যগুলি হলো-

- স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতন আলোচনার পাশাপাশি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরগুলোর সঙ্গে এদের মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করা।
- নারী নির্যাতন দমনে সরকার, এনজিও ও সুশীল সমাজের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে জাতিসংঘের গৃহীত পদক্ষেপ এর পর্যালোচনা।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে গৃহীত সরকারীনীতি ও পরিকল্পনার বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশের নারী শিশুর বর্তমান অবস্থান বিবেচনার মাধ্যমে ভবিষ্যত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা উপস্থাপন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগে এ প্রজন্মের তরুন ছাত্র সমাজের মাঝে নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা নিরূপন করা।
- ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার আইন তুলে ধরা।
- নারী স্বাধীনতার প্রকৃত বিবরণ ও তুলনামূলক আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পরিধিঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন সম্পর্কে ইসলামের অবদান, সাংবিধানিক আইন ও জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনাই হবে আমার অভিসন্দর্ভের পরিধিভূক্ত।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি ঃ

কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই কয়েকটি ধাপে গবেষণা কর্ম চালাতে হয়।

১.৪.১ তথ্য সংগ্রহ:

ক) গ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা

বিভিন্ন ধরনের ইসলামী গ্রন্থ, সংস্থাসমূহের বার্ষিক রিপোর্ট ও জাতীয় দৈনিকগুলো হতে গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বোপরি ইসলামী আলোকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

খ) মাঠ পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন শেষে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ) সাক্ষাৎকার

সবশেষে নির্যাতিত নারী-শিশুর সাক্ষাৎকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

সেকেন্ডারী তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় দৈনিকে প্রাকাশিত সংবাদ এবং সরকার, এনজিও, দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য সমূহকে।

১.৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ:

সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের আওতায় শ্রেণীবিন্যাস করে তালিকা এবং রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও পত্রিকায় প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংঘটনের কারণ ও ঘটনা পরবর্তীসময়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় ও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমস্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্মিত খসড়া প্রতিবেদনের উপর বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের পর তৈরী করা হয়েছে চুড়ান্ত প্রতিবেদন।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

এ অভিসন্দর্ভটি তৈরীতে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের স্বল্পতা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের উপর ভিত্তি করে নারী ও শিশু নির্যাতনের পরিসংখ্যান তৈরী করা হলেও এটি সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কারণ বিভিন্ন ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বিশেষ করে গৃহাভ্যন্তরীন নির্যাতনের ঘটনাগুলি অনেক সময়ই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়না। তাই সংগৃহীত পরিসংখ্যান সবসময় প্রকৃত ঘটনার চাইতে কম রয়ে যায়।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরকারী তথ্যের গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিধি, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের ব্যস্ততা, কিংবা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে অনেক ক্ষেত্রে সময়মত সঠিক তথ্য যোগাড় করা সম্ভপর হয়ে ওঠেনি। প্রতিবেদনটি যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক এবং বিভিন্ন উৎস নির্ভর তাই সংশ্লিষ্ঠ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিজস্ব তথ্য সংগ্রহ সম্পন্নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। বহু সংস্থাই নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরীর পূর্বে তথ্য সরবরাহ না করায় এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয়নি। সময় স্বল্পতা ছিল এ অভিসন্দর্ভ তৈরীর আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময়ে এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা ছিল আমার কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এতদসত্ত্বেও সকলের সঠিক সহায়তায় এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী-শিশু নির্যাতন:একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

নারী-শিশু নির্যাতন:একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নারী-শিশু নির্যাতন সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন নারী শিশু নির্যাতনের একটি ব্যাপক ভিত্তিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া যা ঘরে বাইরে নারী ও শিশুর উপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন নির্যাতনগুলোকে একত্রে ধারণ করতে সক্ষম। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে এ অধ্যায়ের শুরুতেই নারী-শিশু নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করা হলো-

২.১ সংজ্ঞা ঃ

খুব সাদামাটাভাবে বলতে গেলে নারী অর্থ যে কোন বয়সের নারী আর নারী নির্যাতন বলতে আমরা নারীর প্রতি সংঘটিত যে কোন ধরনের নির্যাতনকেই বুঝি। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে "(DEVAW)" নির্যাতন বলতে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে নারীর উপরে যে কোন ধরনের শারীরিক যৌন বা মানসিক আঘাত বা হয়রানি করা বা হুমকি দেয়া, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা অবৈধভাবে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাকে বুঝায়।

Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violence Against Women- এ প্রদানকৃত নেপালের Center for Women and Community Development-এর Country Report- এ নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়ঃ

Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or even freedom of movement in account of their gender. It is clearly based on the unequal power relations between men and women underlying which is the patriarchal social structure that is constructed reinforced and perpetuated by socio-political institutions put in place by men and which hereby ensure than

Dhaka University Institutional Repository

men, by virtue of their gender have power and control over women and children. Therefore, violence against women is well defined as ..... any act of gender based violence that results or in likely to results in physical sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.[১]

বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোনো কাজ অথবা আচরণকে বোঝাবে যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে । এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালীভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণও বোঝাবে। অর্থাৎ নারী নির্যাতন বা নিগ্রহ বলতে পরের পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলো বোঝাবে:[২]

১. Report of the Fourth World Conference on Women, United Nations, Beijing, 1995, Section on D: Violance against Women, Dhaka: The Royal Danish Embassy, 1997, P. 19.

২. ইউনিসেফ, *জাতিসংঘ শিশু সনদ*, ১৯৮৯, ঢাকা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১৯৯২, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

(১) পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন- প্রহার, কন্যা-শিশুর ওপর যৌন-নিগ্রহ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রণাদায়ক রীতি, স্বামী ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতন এবং নারীকে কোনো কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্যাতন।

(২) সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন, ধর্ষণ, যৌন-নিগ্রহ, যৌন-হয়রাণী এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন, নারী অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা।

(৩) নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন-দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণ করানোও বোঝাবে।

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগই এই দলে রয়েছে। অর্থাৎ এদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। এই সংজ্ঞানুযায়ী শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও চর্চা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশে কিন্তু তেমনটি হচ্ছেনা। এখানে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মত শিশুর কোন একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এই সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষা দানকারী সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের (যেমন কাজ সম্পর্কিত) অধিকাংশতেই যে বয়স পর্যন্ত রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা ১৮ বছরের বেশ নিচে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ১১ বছর পর্যন্ত। আর একটি বিষয় হচ্ছে, আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা এই যে, ১৮ বছরের বয়সের অনেক আগেই শৈশব কালের সমাপ্তি ঘটে। সনদের সঙ্গে এই সব অসামঞ্জস্য এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন ও নীতির মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতির অর্থ হচ্ছে, অনেক শিশুই সনদ অনুসারে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, যদিও তাদের সেটি পাওয়ার কথা। শিশু নির্যাতন বলতে এমন কাজ বা আচরণকে বোঝাবে যা শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং শিশুর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিসাধন করে যেমন অপহরণ, চুরী, শিশু ধর্ষণ, অঙ্গহানি, পাচার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতনের ধরন ঃ

নারী নির্যাতন বর্তমানে জেন্ডার সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীই হচ্ছে এখন নির্যাতনের লক্ষ্য-বস্তু। যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সহজ উপায় হলো নারীকে নির্যাতন করা। সর্বকালে এবং সর্বযুগে নারী নির্যাতন ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। শুধু যুগে যুগে তার রূপ বদল হয়েছে। পৃথিবী উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেলেও নারী নির্যাতন অনেক ক্ষেত্রে 'আইয়ামে জাহেলিয়া'র মতোই রয়ে গেছে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯০১ সালের এই দিনে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা ভাষা নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সকল নারী সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের অধিকার আদায়ের দাবীতে সোচ্ছার হয়ে উঠেছিল। অবিস্মরণীয় এই দিনে বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের অন্তর্ভূক্ত লক্ষ-কোটি নির্যাতিত প্রাণ একসুত্রে গাঁথা হয়ে যায়। সুদূর লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ কিংবা এশিয়াসহ বিশ্বের যে অঞ্চলেই ঘটুক না কেন, নারী নির্যাতনের ঘটনাবলী যে মানবাধিকার লংঘনের সমতুল্য অপরাধ সে কথা আজ সর্বজন বিদিত। বর্তমানে বাংলাদেশের নারী ও কন্যা-শিশু ধর্ষণ, নারী হত্যা ও নির্যাতন, নারী ও কন্যা-শিশু পাচার, যৌন হয়রানী ও যৌন শোষণ এবং নারীকে বিশ্ব বাজারে পুরোপুরি পণ্যে পরিণত করার ঘটনা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তা সর্বকালের নারী নির্যাতনের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমন্ডকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা রাখা হয়েছে পেছনের সারিতে। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধু সাংসারিক কাজেই ব্যবহার করা হয়। সমাজ ও দেশ গঠনে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদুত মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহারা নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তাঁর এই আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে লক্ষ্য করা যায় দেশের আইন-কানুনকে উপেক্ষা করে নারী নির্যাতনের মাত্রা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত আমাদের দেশে নারী নির্যাতন শুরু হয় মাতৃগর্ভ থেকে কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বে সর্বত্রই নারী ও শিশু নির্যাতিত হলেও কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে বা দেশে নারী শিশু নির্যাতনের স্বরূপ নির্ধারিত হয় সেই সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এই গবেষণার প্রতিবেদনে জাতিসংঘ প্রণীত নারী নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রের আলোকে বাংলদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনগুলোকে অন্ত র্ভূক্ত করা হলেও আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনগুলোর ভয়াবহতা ও বিচার বিবেচনা করে নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।[৩]

২.২.১ গৃহনির্যাতনঃ

নারী নির্যাতনের এই ধরনটির সঙ্গে আমাদের দেশের নারীরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। বিয়ের আগে নিজ পরিবারের সদস্যদের দ্বারা আর বিয়ের পর স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের কথাও কাজে মেয়েরা হয় নানা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার। সমাজে মেয়েরা অবহেলিত হবার কারনে এ জাতীয় নির্যাতনগুলো অনেক সময়ই প্রকাশিত হয়না আবার প্রকাশিত হলেও মেয়েদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনেকাংশেই নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না। আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গৃহ নির্যাতনগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি নির্যাতনের দ্বারা মেয়েরা বেশি নির্যাতিত হয় সেগুলো হল স্বামী কর্তৃক নির্যাতন/স্ত্রী পেটানো, শ্বশুর বাড়ীর নির্যাতন, যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতন, বহুগামিতা, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ, নিজপরিবারের নির্যাতন ও নিকটাত্মীয় পুরুষ কর্তৃক নির্যাতন ইত্যাদি।

৩. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, *বাংলাদেশে নারী প্রতি সহিংসতা-২০০৫*, ঢাকাঃ ২০০৬, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২ সামাজিক নির্যাতনঃ

ঘরের ভেতর নারীরা যেমন নানাবিধ নির্যাতনের শিকার, ঘরের বাইরে বৃহত্তর সমাজেও তারা ততোধিক নিরাপত্তাহীন। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা ঘাটে এমনকি নিজ বাড়ীর অঙ্গিনাতে মেয়েরা হচ্ছে নির্যাতিত। নির্যাতনকারী ব্যক্তিটি কখনো প্রতিবেশী, অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এলাকার বখাটে যুবক, কিংবা তথাকথিত মূর্খ ফতোয়াবাজ। পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এবং বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতির সুযোগে ঘরে বাইরে সব স্থানেই নারীকে দেখা হচ্ছে সহজলভ্য ভোগের পণ্য হিসেবে। আর তাদের এই সহজলভ্যতার বাধ সাধলেই মেয়েদের উপর নেমে আসে নানামুখী নির্যাতন। সামাজিক নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে যে নির্যাতনের যে বিশেষ ধরনগুলো নারীর জীবনে নির্মম পরিনতি ডেকে আনে সেগুলো হচ্ছে; ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, ভুল ফতোয়া, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, নারী ও শিশু পাচার, শিক্ষাঙ্গনে নারী নির্যাতন, কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন, অপহরণ, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি, ইভটিজিং, আত্মহত্যায় বাধ্য করা ইত্যাদি।

২.২.৩ রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ঃ

গৃহভ্যন্তরীণ এবং সামাজিক নির্যাতনের পাশাপাশি নারী নির্যাতনের যে ধারাটি বর্তমানে সময়ে সবচাইতে বেশি আলোচিত সমালোচিত তা হচ্ছে নারীর উপর ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিযার্তন। পুলিশসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে এসব নির্যাতন। রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের এসব ঘটনাগুলো দ্বারা নারীরা কেবল নির্যাতিতই হচ্ছেনা বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মচারীরা নিজেরাই নারী নির্যাতনে লিপ্ত হয়ে পড়ায় একদিকে বিভিন্ন সামাজিক নির্যাতনে অংশ নেয়া দুর্বৃত্তরা হয়ে উঠছে আরো বেশি বেপরোয়া আর অন্যদিকে প্রচলিত আইনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে নারী হয়ে উঠছে অধিকতর অসহায়। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দ্বারা সাধিত এসব রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নারী ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, নারী নির্যাতনের উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষিত বিভিন্ন গৃহ ও সামাজিক সন্ত্রাসের দায়ভার ও রাষ্ট্রের উপরই বর্তায়। বলতে গেলে নারীদের উপর বিভিন্ন গৃহ ও সামাজিক নির্যাতন ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ঢিলেঢালা ভাবও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের আওতাভুক্ত।[৪]

৪. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, *বাংলাদেশে নারী প্রতি সহিংসতা-২০০৪*, ঢাকাঃ ২০০৫, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ নির্যাতনের কারণ ও প্রেক্ষাপট

জেন্ডার-ভিত্তিক নারী নির্যাতন ক্ষমতার বলয়ে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অসম জেন্ডার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন নারী-পুরুষের এই অসম সম্পর্কের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে অদ্যাবধি সেভাবেই চলছে। পারিবারিক পরিমন্ডলে সহস্র বছরের সামাজিকীকরণের ফলে সবক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্যের এ অবস্থায় নারী পুরুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে।

সুতরাং নারীও এতকাল জেন্ডার বৈষম্য ও তার অধঃস্তন অবস্থা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

The basic factors is the prevalent patriarchal norms values, tradition and customs, which legitimate and maintain unequal power relation between men and women in all social structures: family, community work place and even in the state. This is exacerbated by several other factors i) poverty, which gives rise to dowry, trafficking, prostitution, kidnapping; ii) commodification and derogatory representation of women in media and entertainment, e.g. audio-visual media showing violent and pornographic matters; (iii) state inaction in eliminating violence against women.[৫]

যৌন আচার-আচরণে নিয়ম শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় বিবাহের ভূমিকা সাম্প্রতিক কালে আমাদের সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্যের প্রচণ্ড চাপ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-এশীয় জনবহুল দেশগুলোতে প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর অর্থনৈতিক চাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। সুতরাং কেবল ঘরে নয় বাইরেও মেয়েদের পদচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। ফলে বহু বিকৃত রুচির মানুষের লোভ লালসা চরিতার্থের সুবর্ণ সুযোগও মিলে যাচ্ছে খুব সহজেই।

৫. উদ্ধৃতি: প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সে কারণেও বাংলাদেশে সম্প্রতি নারী ও কন্যা-শিশু পাচারের ঘটনা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব অর্জন স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্যপুর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু বিবাহের কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ থাকে। এতে স্ত্রীদের প্রতি স্বামী বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি দাম্পত্য-কলহের সৃষ্টি করে। এছাড়া স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। এগুলো নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক কালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই বিবাহ হচ্ছে যৌতুকের মাধ্যমে। যৌতুকের দাবি পূরণকে কেন্দ্র করে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে তেমনি উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতেও যৌতুকের পরিমাণের ওপর স্বামী পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করে। গ্রামের নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর নারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাব পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা হ্রাস করেছে। অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেও নারীর গৃহের কাজ স্বীকৃতিহীন ও পারিশ্রমিকহীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের কাজ কম দামী ও অবমূল্যায়িত। অর্থনৈতিক বিচারে সেই দশকেই অধিকতর সফল বিবেচনা করা হয় যারা তাদের নারীদের কাজের মূল্যায়ন করে এবং সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ তাই মানব উন্নয়ন সূচকের সঙ্গে জেন্ডার-প্রেক্ষিতকে সংযুক্ত করেছে। অথচ বাংলাদেশ তাদের নারীদের অর্থনৈতিক উৎপাদক রূপে উপেক্ষা করে তার নিজস্ব উন্নয়নকে আড়াল করছে।

নৃতাত্ত্বিকভাবে এটা স্বীকৃত যে, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সঞ্চারিত হয় নারীদের মাধ্যমে। কারণ সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তারা মূল দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রাচীন যুগে নারীরা তাদের মাধ্যমে অন্যান্য নারীদের কাছ থেকে তাদের কাজের শিক্ষা লাভ করত যা ছিল মূল্যবান কিন্তু বিস্তৃত পারিবারিক শাখা প্রশাখাসহ কৃষি ভিত্তিক সমাজ ও শিল্পায়িত শহরে পরিবেশ ভিত্তিক, ক্ষণস্থায়ী ও কম নারী-সদস্যমূলক

Dhaka University Institutional Repository

একক পরিবারে পরিণত হওয়ায় নারীর জ্ঞানের এই ধারাবাহিকতা লুপ্ত হয়। এটাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার বদলে উল্টো আধুনিক নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং এর ফলে কাজের অন্যান্য সুযোগ ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে।

বিশ্বব্যাপী পুরুষের চাইতে নারীর অনুন্নত মানের খাবার তাদের নিচুমানের জীবন প্রদান করেছে। বাংলাদেশই কেবল একমাত্র দেশ নয় যেখানে নারীদের নিম্নমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং যেখানে অনেক নারী অনাবশ্যকভাবে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রয়োজন দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে বিবেচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও নেপাল হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে নারীরা পুরুষের মতো দীর্ঘদিন বাঁচে না। আধুনিক জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ণয়ের দরুণ কন্যা-ভ্রুণ হত্যার ফলে অনেক দেশে নারী ও পুরুষ লিঙ্গের মাধ্যকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে কন্যা সন্তানের চাইতে পুত্র সন্তান বেশি জন্মলাভ করছে, যা ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করবে।[৬]

পুরুষ সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে কখন কিভাবে নির্যাতন করে এ বিষয়টি অনেকটা নারীর বোধগম্যতার উর্ধ্বে বলেই কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। নারীর প্রতি পুরুষের এই যে আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তা পুরুষ একদিনে অর্জন করেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সুচনাই হয় পুরুষকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে। আর পুরুষ নিজে প্রশিক্ষিত হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আবার এ ভাবাদর্শে নারীকে দীক্ষিত করার দায়িত্বভারও গ্রহণ করে। যেহেতু অর্থনীতির মুল চাবিকাঠি এতোদিন সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হস্তগত, তাই নারীরা দলে দলে পুরুষের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়ে পড়েছে।

এছাড়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই এমন যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে আমাদের মতো গরিব দেশের অধিকাংশ পিতারা চান তাদের কন্যা সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই স্বামী নামক অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করে নিজের বোঝা লাঘব করতে। যেহেতু একটি ভুল পন্থায় পিতা তার সমস্যার সমাধান করেন, তাই নারী নিজেকে মানুষ রূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার আগেই স্বামী কর্তৃক পুনঃশাসিত হয়ে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।[৭]

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৭. উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক রিপোর্ট, *ক্ষমতায়ন , সংখ্যা-৫*, ঢাকা : ২০০৩, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের স্বরূপ ও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের স্বরূপ ও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নারী নির্যাতনকে একটি গ্রহণযোগ্য ও ব্যাপক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি দেশে বর্তমানে নানা ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনকে আলোচ্য সংজ্ঞার সাথে মিল রেখে গৃহ নির্যাতন,সামাজিক নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন এই তিন শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন সালে সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ আলোচনায় নির্যাতনের ধরণ, দীর্ঘমেয়াদী গতিধারা, নির্যাতিতদের সংখ্যা, নির্যাতন পরবর্তী ঘটনাবলী এবং নারী-শিশুর আইনী অধিকার, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ও সুপারিশ এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আলোচিত হয়েছে।

সারণী- ১ ঃ ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নারীও শিশুর প্রতি সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র।[১]

ধরণ	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
ধর্ষণ	৭৭৬	১৫৫০	১০৭২	৯২৮	৭২১
যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতন	২৭১	১২৪	৩৭১	৩৮৫	৩৭৮
এসিড	২৩৮	২৫৪	২১৮	১৪০	১১২
হত্যা	৪১১	৭৪০	৩২৮	৩১৯	৩৭৮
পাচার	৩৩৫	৩২৯	৩৭৭	২৬৭	৭০২
ফতোয়া	১০	২৭	৩২	৪০	২৫
মোট	২০,৪১	৩০,২৪	২,৩৯৮	২,০৭৯	২,৩১৬

১. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির রিপোর্ট, ঢাকাঃ রিসোর্স সেন্টার, ২০০৭, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্রঃ ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র।

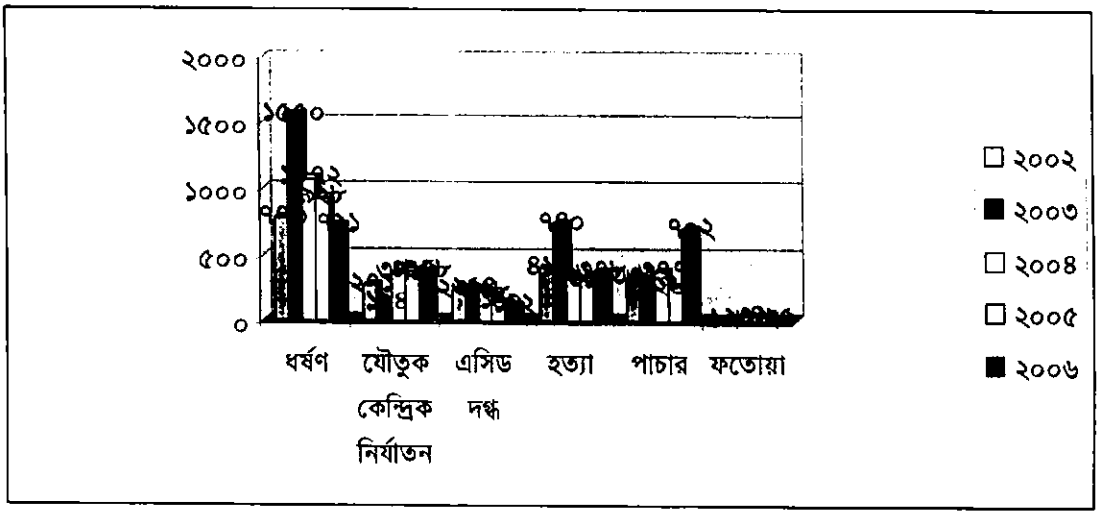

তথ্যচিত্র ও রেখাচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নারী শিশুর প্রতি বহুল প্রচলিত সহিংসতার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, যৌতুক কেন্দ্রিক নির্যাতন, এসিডদগ্ধ, হত্যা, পাচার, ভুল ফতোয়া প্রভৃতি। ২০০৬ সালে এ ধরনের শিকার হয়েছে ২,৩১৬ জন নারী ও শিশু। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ হার কিছু কম। এখানে উল্লেখ্য যে এসিড, ধর্ষণ, ফতোয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহিংসতার মাত্রা কিছুটা কমেছে। যেমন-২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ সালে এসিডদগ্ধের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩৮,২৫৪,২১৮,১৪০ জন অপরদিকে ২০০৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ১১২ জন। ধর্ষণের সংখ্যাও এবছর কমেছে যেমন ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৭৬, ১৫৫০ ১০৭২, ৯২৮। অপরদিকে ২০০৬ সালে এর সংখ্যা ৭২১টি। ভুল ফতোয়ার সংখ্যাও এবছর কম ছিল। তবে এবছরের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়টি হলো নারী ও শিশু পাচারের হার অন্যান্য বছরের তুলনায় আশংকাজনক। অর্থাৎ তার সংখ্যা ৭০২টি। ২০০৬ সালটি নারী সহিংসতার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এবছর বহুল আলোচিত মাম্মী হত্যা মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট আসামীদের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। এছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সহিংসতার সুষ্ঠু বিচার হয়েছে। অবশ্য গত দুই বছরের মত জনপ্রতিনিধি নির্যাতকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত এসকল কর্মকর্তা কর্মচারীরা নির্যাতকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত এসকল কর্মকর্তা কর্মচারীরা নির্যাতন প্রতিরোধে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন না করে বরং নিজেরাই নির্যাতকের ভূমিকা পালন করেছেন। এ অবস্থায় নির্যাতন প্রতিকারে অংশ না নিয়ে যখন তারা নিজেরাই নির্যাতক হয়ে যান তখন ঘরে বাইরে নারীর মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেতে কষ্ট করতে হয়না। আইনগত সহায়তার ক্ষেত্রে নারীরা যে ধরনের বাধা বা চ্যালেঞ্জ সমূহের সম্মুখীন হচ্ছেঃ

১. নারীর প্রতি যে ধরনের সহিংসতা বা নির্যাতন হচ্ছে তার অধিকাংশ নির্যাতনই প্রচলিত আইনের মাধ্যমে প্রতিকার করা যাচ্ছেনা। যেমন বছরের পর বছর নির্যাতন শারীরিক-মানসিক কষ্ট সহ্য করার পরও স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদান। এক্ষেত্রে আইন স্ত্রী স্বামীর moveable অস্থাবর বা immoveable কোন আপত্তির অংশ পায়না।

২. আদালতে নারীর চরিত্র বিষয়ে কোন প্রমান ছাড়াই কুৎসা বর্ণনা করে। আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনলেও বিষয়টির কোন প্রতিকার নাই।

৩. তালাক দেওয়ার পর তালাক চূড়ান্ত হওয়ার আগেই স্ত্রী বাড়ী থেকে বের হতে বাধ্য হয়।

৪. অভিভাবকত্বের অধিকার সাধারণত নারীর নাই।

৫. আদালতে নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণের মোকাদ্দমা দায়ের করলে সর্বক্ষেত্রেই আদালত মাসিক ভরণপোষণ নূনতম হারে নির্ধারন করে, এটা নারীর প্রতি নেতিবাচক মানসিকতারই বহিঃ প্রকাশ মাত্র।[২]

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ বছরের তথ্য চিত্র

সারণী-২ ঃ বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র।[৩]

অভিযোগের প্রকৃতি	সংখ্যা ২০০১	সংখ্যা ২০০২	সংখ্যা ২০০৩	সংখ্যা ২০০৪	সংখ্যা ২০০৫
বহুবিবাহ	১০৮	১৭৮	১৭৮	১৩৩	১৩৫
দেনমোহর	১৪২	২৩৫	৩৪৫	২২০	২৫৬
যৌতুক	২৪৯	৩৪৬	৪৮৬	৮৭৯	৪৪০
তালাক	৯৮	১৪৮	১৬৫	১৯৭	১৭২
দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার	২১৪	৩৩০	৫৬৩	৫০২	৪৪৪
ভরণ-পোষণ	৩৩৮	৬০৩	৭৮৯	৭৪৯	৮২৯
নারীদের প্রতিনিষ্ঠুরতা	১৫৯	৩২৯	৫১২	৪৬২	৩৯২
সম্পত্তি	৬৬	১০৪	১৬৮	১০৫	৭৬
অভিভাবকত্ব	৪৪	১১২	৫২	৪২	২৮
ধর্ষণ	৭	৪৬	৭২	৬৮	৪১
বিবিধ	২৮৩	৫১৩	৬৪০	৬০৫	৬০৪
মোট	১৭০৮	২৯৪৪	৩৯৭০	৩৫৬২	৩৪১৭

৩. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির রিপোর্ট, ঢাকাঃ আইন সহায়তা শাখা, ২০০৭, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

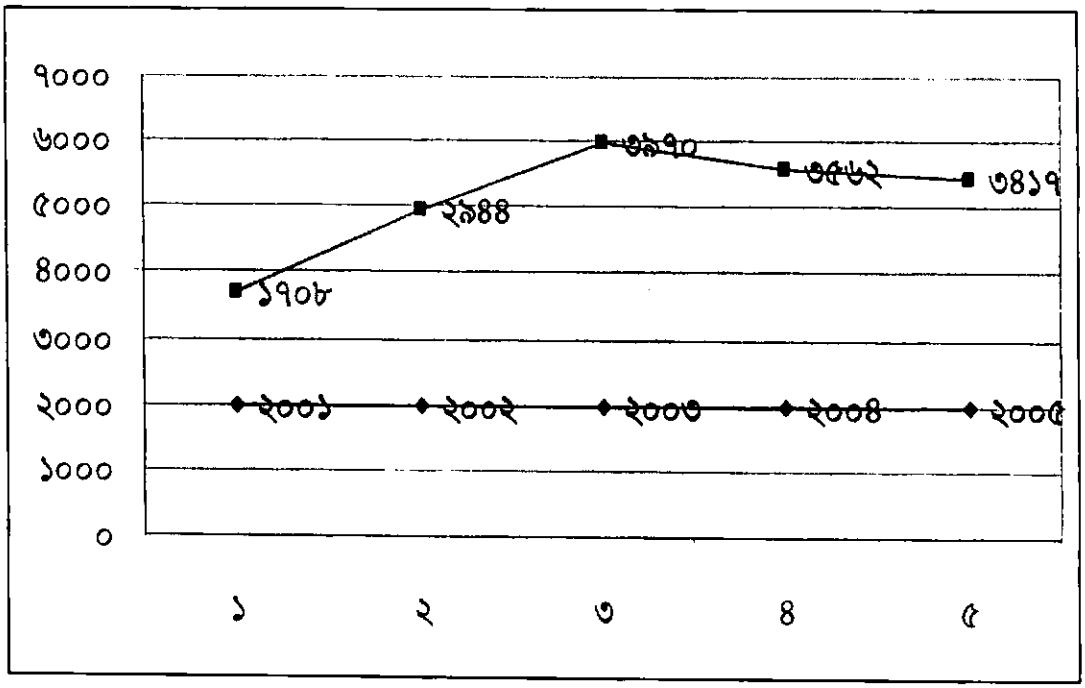

উপরোক্ত তথ্যচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২০০১, ২০০২, ২০০৩ সালে নারী নির্যাতনের কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনার অভিযোগ নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির কাছে আগত অভিযোগ কারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ২০০১ সালে যেখানে মোট অভিযোগকারীর সংখ্যা ছিল ১৭০৮, ২০০২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯৪৪ এবং ২০০৩ সালে মোট অভিযোগকারীর সংখ্যা ছিল ৩৯৭০। পরবর্তী দুবছর অর্থাৎ ২০০৪ ও ২০০৫ সালে অভিযোগকারীর সংখ্যা মোটামুটিভাবে কাছাকাছি অবস্থানেই ছিল। ২০০৪ সালে সংখ্যা ছিল ৩৫৬২ এবং ২০০৫ এ ৩৪১৭। অর্থাৎ সঠিক বিশ্লেষণে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির আইন সহায়তা কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের আলোকে বলা যায় নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্রটি একই অবস্থানে স্থির আছে, তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তথ্যের আলোকে দেখতে পাইনা।[৪]

৪. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বার্ষিক রিপোর্ট, *"বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ২০০৫"*- প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বর্ণনা

৩.১.১ এসিড সন্ত্রাস

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে নারী ও নির্যাতন দুটি শব্দ সম্পর্কযুক্ত। যৌতুকের জন্য নির্যাতন, ভুল ফতোয়া, পাচার ইত্যাদি নানাবিধ নির্যাতন নানা মাত্রায় সব যুগেই ঘটেছে। আর এ ধরনের নির্যাতনে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন কৌশল। নির্যাতনে ব্যবহৃত এ ধরনের কৌশলের মধ্যে এসিড সন্ত্রাস অন্যতম। এই এসিড হচ্ছে এক ধরনের তরল রাসায়নিক এবং অত্যন্ত শক্তিশালী দাহ্য পদার্থ। Acid Survivors Foundation (ASF) কর্তৃক প্রকাশিত Annual Report-2004 এসিড সম্পর্কে বলা হয়েছে, Acid is a corrosive cubstance that can corrode metal. Once in contact with skin, acid causes skin tissue to melt, exposing the bones underneath or leading to the loss of eye (s) hearing damage to hands or joints Permanent physical disfigurement is unavoidable and serious disability frequent. আর এসিড যখন নিক্ষেপ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই নারী একাধারে শারীরিক ক্ষতি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আর্থিক ক্ষতি ও সামাজিক বঞ্চনার মধ্যে নিপীড়িত হয় অথবা প্রায়শঃ মৃত্যুবরণ করে।[৫]

নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা সহ নারীর ক্ষমতায়ন যেখানে বর্তমান সময়ের দাবী সেখানে নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ তথা অমানবিক নির্যাতন ও সহিংসতা শুধু উদ্বেগের বিষয় নয় বরং এ অবস্থা বাংলাদেশী নারীর অবস্থান ও মর্যাদাকে আজ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে নারীর প্রতি এসিড সন্ত্রাসের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এসিড সন্ত্রাস রোধে প্রচলিত তৎপরতা ও সেবাসমূহ ও তার সীমাবদ্ধতা এবং সর্বোপরি এসিড সন্ত্রাস রোধে প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশও করা হয়েছে।

৫. উদ্ধৃতিঃ উইমেন ফর উইমেন, *ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৭*, ঢাকাঃ ২০০৫, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৩ মে-১৯৯৯ থেকে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত এসিড আক্রান্তের সংখ্যা[৬]

সময়কাল	ঘটন সংখ্যা	আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা			
		নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
মে-ডিসেম্বর ১৯৯৯	১৫৫	৮০	২৩	৩৬	১৩৯
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০০	১৭২	১১৪	৩৯	৭৩	২২৬
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০১	২৫০	১৩৮	৯৪	১১১	৩৪৩
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০২	৩৬৬	২২১	১৩৯	১২৪	৪৮৪
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৩	৩৩৫	২০৪	১১৭	৮৯	৪১০
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৪	২৬৬	১৮৩	৬৩	৭৬	৩২২
মোট					১৯২৪
জানুয়ারি ২০০৫	৯	৮	১	২	১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫	১৫	১০	৫	৩	১৮
মার্চ ২০০৫	১৪	৯	৬	৩	১৮
মোট ২০০৫	৩৪	২৭	১২	৮	৪৭

বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং প্রতিবছরই নারীর আক্রান্তদের সংখ্যা সর্বাধিক। নারীর পরেই রয়েছে শিশুদের অবস্থান। ১৯৯৯ সালে নারী আক্রান্তদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৮০ জন সেটা ২০০২ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ২২১ জনে। যদিও ২০০৩ ও ২০০৪ সালে এ সংখ্যা কিছুটা কমেছে যা যথাক্রমে ২০৪ ও ১৮৩ জন। আবার ২০০৫ সালের প্রথম তিন মাসের চিত্র থেকে দেখা যায়, জানুয়ারি মাসে নারী আক্রমনের সংখ্যা ৮ জন, ফেব্রুয়ারিতে ১০ জন, মার্চে ৯ জন। অর্থাৎ এমন কোন মাস নেই যখন নারী সমাজের উপর এসিড নিক্ষেপ করা হচ্ছে না। এসিড সন্ত্রাসের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহুমুখী কারণ জড়িত রয়েছে। প্রত্যক্ষ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে যৌন প্রস্তাব, প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, নানা ধরনের অশালীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, পারিবারিক ও জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ, দীর্ঘদিনের কলহের জের দীর্ঘদিনের বিবাদ, যৌতুক প্রদানে ব্যর্থতা, স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দেয়া, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, রাজনৈতিক কারণ, অপহরণে বাধা, পাওনা টাকা চাওয়া, মামলা করা ও অন্যান্য শত্রুতা ইত্যাদি।

৬. উদ্ধৃতি ঃ এ.এস.এফ কর্তৃক রেকর্ডকৃত তথ্য-২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ঘটনা সংঘটনের স্থানে উপস্থিত থাকার কারণে এসিড শিকারের ঘটনাও ঘটে থাকে। অন্যান্য অনেক পরোক্ষ কারণে এসিড সন্ত্রাস ঘটে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে এসিডের সহজলভ্যতা, কম মূল্যে বিক্রয়, এসিড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে জোরালো নীতিমালার অভাব, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, আইনের যথাযথ কার্যকারিতার অভাব, পুলিশের অদক্ষতা ও দুর্নীতি, সাক্ষীদের হয়রানি ইত্যাদি। এছাড়াও বেকারত্ব, হতাশা, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, কর্মজীবী নারীদের নিরাপত্তার অভাব, মারদাঙ্গা ও প্রতিহিংসামূলক চলচ্চিত্র, সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা-এ সকল পরোক্ষ কারণ এসিড সন্ত্রাসের পেছনে জড়িত রয়েছে।

এই এসিড সন্ত্রাস যারা করছে তাদের অধিকাংশই যুবক শ্রেণীর এবং তাদের অধিকাংশেরই বয়স ১৮-২২ থেকে ২৫-৩০ এর মধ্যে এবং তারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানুষ। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, এসিডের প্রধান শিকার হয় সাধারণত গ্রামের মেয়েরা এবং এসিড নিক্ষেপকারীদের বেশিরভাগই কৃষক, মজুর, দিনমজুর, দোকানদার এবং সাধারণ ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এমন দেখা যায় যে, এসিড আক্রান্ত ও এসিড নিক্ষেপকারী একে অপরের পূর্ব পরিচিত এবং তাদের সামাজিক অবস্থাও অভিন্ন। তারা সামাজিকভাবে সাধারণতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে জানা যায় যে, এরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত।[৭]

বাংলাদেশে এসিড সংক্রান্ত সরাসরি কোন আইন অতীতে ছিল না। তবে অন্যান্য আইনের আওতায় যেমন "The poisons Act-1991"তে এসিড বা বিষ জাতীয় দ্রব্যের মজুদ ও বিতরণ ১৯৯৫ ও ২০০০ সালে নারী শিশু নির্যাতন আইনে দহনকারী পদার্থ বিষয়ক বিধানের আওতায় এসিড সংক্রান্ত বিধি নিষেধের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ সকল আইনে সীমিত পরিসরে এসিড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। তবে এসিড সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ আইন প্রণয়ন হয় ২০০২ সালে।

৭. ইউনিসেফ ও এ.এস.এফ. পরিচালিত জরীপ-২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২ সংক্রান্ত বিলটি ২০০২ সালের ১৪ মার্চ সংসদে পাশ হয়। এ আইনে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য, অ-আপোসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত, ৯০ দিনের মধ্যে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে অপরাধ সংগঠনে সহায়তাকারীর শাস্তির বিধান, মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনানুযায়ী এসিড নিক্ষেপের দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবৎজীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত ১লক্ষ টাকার অর্থদন্ড। এছাড়া এসিড দ্বারা আহত করার জন্য ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকার জরিমানা করার বিধানও এই আইনে রয়েছে।[৮]

এসিড সংক্রান্ত আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল যে, আইনের অভাবে এসিড সন্ত্রাস সংঘটনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এসিড সন্ত্রাসের বর্তমান বাস্তবতা এই যে, আইন প্রণয়নের পরও এসিড সন্ত্রাস কমছে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পেছনে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের অদক্ষতা ও দুর্নীতি, বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা, প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণসমূহ দায়ী। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মোট ১১৮৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় অধিকাংশেরই মামলা হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত হয়েছে মাত্র ৮৯২টির।[৯]

অপর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলার সংখ্যা ১৯৯৮ সালে ৬৯টি, ১৯৯৯ সালে ৫৭টি, ২০০০ সালে ১৬৫টি, ২০০১সালে ৬৯টি, ২০০২ সালে ৬৩টি। এসিড সন্ত্রাসের মামলার সংখ্যার সাথে মামলার নিস্পত্তির পরিসংখ্যান খুব একটা সন্তোষজনক নয়। খুবই অল্প সংখ্যাক মামলার নিস্পত্তি হয় ও অপরাধীর সাজা নির্ধারিত হয়। উপরন্তু রায়কৃত সাজাসমূহের সঠিক কার্যকারিতা প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায় না।

৮. আইন ও সালিশ কেন্দ্র বুলেটিন-২০০২, পৃ. ২১-২২।
৯. দৈনিক দিনকাল, ৭ এপ্রিল-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এএসএফ এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০১ সালে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলো ৩৪০ জন যার ২৯০টির ঘটনা রেকর্ডকৃত এবং ১৬টি মামলার নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০০২ সালের মার্চ থেকে ২০০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্ন আদালতে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে ৩৯টি মামলার শাস্তির রায় পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সূত্র মতে ২০০১ সালে এসিড নিক্ষেপের মামলায় ২ জনের মৃত্যুদন্ড, ১০ জনের যাবৎজীবন কারাদন্ড ও ১জনকে ৮ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালের এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় প্রদত্ত এক রায়ে ৪জন আসামীর প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদন্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে।[১০]

এসিড সন্ত্রাসের শিকার ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয় যে, আইন প্রণয়ন করেও এসিড সন্ত্রাস আশানুরূপভাবে দমন করা সম্ভব হচ্ছে না, বিচ্ছিন্ন কিছু মামলার নিষ্পত্তি এবং সাজার পরিসংখ্যান জানা গেলেও এসিড সন্ত্রাস সংঘটনের মোট ঘটনার তুলনায় তা খুবই নগণ্য যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এসিড সন্ত্রাসের দৃষ্টান্তমূলক সাজা জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে না বলে এসিড সন্ত্রাসের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড থাকা সত্ত্বেও এসিড নিক্ষেপকারী ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে না। এমনকি এর জন্য অন্যরাও এসিড নিক্ষেপ করতে যেয়ে কোনরূপ ভয়ের শিকার হচ্ছে না।

বর্তমান সভ্যতার উন্নয়নে নারীদের অবদানের যেখানে বিকল্প নেই সেখানে এসিড নিক্ষেপের মত ঘটনা নারী সমাজের জন্য এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। এসিড নিক্ষেপ শুধু তাকে শারীরিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না মানসিকভাবেও পঙ্গু করে দেয় এবং তার সামাজিক জীবনটাও এক অর্থে ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তাকে বাকি জীবন বাবার সংসারে গলগ্রহস্বরূপ কাটাতে হয় এবং

১০. দৈনিক দিনকাল, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রেও প্রায়শঃ এসিড নিক্ষেপ পরিবার ভাঙ্গনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তির শাস্তি হয় না। পক্ষান্তরে নিরপরাধ ও ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েটিকে সামাজিক গঞ্জনা, পারিবারিক অবহেলা সহ্য করতে হয়। যা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এমনকি অনেক নারীই এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়ে পরবর্তীতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এসিড আক্রান্তদের আইনি সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, নিরাপত্তা, স্বল্পমূল্যে সাময়িক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ পুনর্বাসনের কাজ করে যাচ্ছে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এ.এস.এফ), বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে এএসএফ প্রত্যক্ষভাবে শুধু এসিডদগ্ধদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। ১৯৯৯ সালের মে মাস থেকে বাংলাদেশে এএসএফ এডিসদগ্ধদের শারীরিক ও সামাজিক পুনর্বাসন, মামলা করা ও পরিচালনার সহায়তার কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে এএসএফ প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে এসিডদগ্ধদের চিকিৎসা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে 'ঠিকানা' নামে ২০ শয্যার একটি নার্সিং হোম গড়ে তোলে কিন্তু অপারেশন হতো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে চিকিৎসার দীর্ঘসূত্রিতা রোধকল্পে সাভারের সিআরপি-তে ১৫ শয্যার একটি ওয়ার্ড নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু দূরত্ব ও ডাক্তারদের যোগাযোগের সমস্যা উত্তরনের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে বনানীর একটি ভাড়া বাড়িতে 'জীবন তারা' নামে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। যেখানে এসিডদগ্ধদের প্লাষ্টিক সার্জারীসহ শারীরিক-মানসিক সুস্থতার ব্যবস্থা রয়েছে।[১১]

এসিড সন্ত্রাস রোধে আইন প্রণয়নসহ এসিড দগ্ধদের সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠার ফলে মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন হলেও কার্যতঃ এসিড সন্ত্রাসের হার না কমে বরং ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে যা বিভিন্ন সংস্থার জরিপের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পূর্বোক্ত

১১. মাহবুবা সুলতানা, *ক্ষমতায়ন, সংখ্যা*-৭, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন-২০০৫, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের জন্য সমাজ গবেষকসহ সমাজের অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, এসিড সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না বরং এর যথাযথ বাস্তবায়ন, সমাজে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপের পাশাপাশি মানুষ হিসাবে মানুষের মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে যা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া এসিড সন্ত্রাসের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও যে সকল পরোক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী কারণ রয়েছে সেগুলোও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। এবং সেগুলো নির্মূলের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের সীমাবদ্ধতা, স্বাস্থ্য বিভাগের সীমাবদ্ধতা, এসিডদগ্ধদের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, এসিড সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।[১২]

১. এসিড সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপন নয় বরং প্রতিটি এসিড সন্ত্রাসের ঘটনার যথাযথ বিচার করা বিচারাধীন মামলার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা ও রায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

২. এসিড আক্রান্তদের জন্য পৃথক, স্বাধীন ও নিরপেক্ষতদন্ত সেল, মনিটরিং সেল ও চাঞ্চল্যকর মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা ও তদন্তকাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. বিচারকার্য ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সততার সাথে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা।

১২. মাহবুবা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এসিড সন্ত্রাস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের তদন্ত কর্মকর্তাদের মামলার প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. এসিড আক্রান্তদের সুচিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসকের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা ও এসিড আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য আক্রান্তদের হাতের নাগালে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

৬. জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বেতার ও টেলিভিশনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও প্রিন্টিং মিডিয়াতে এসিড আক্রমণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং একই সাথে এসিড আক্রান্তদের ভয়াবহ ভোগান্তির চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা।

৭. এসিড ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের পরিচিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা।

৮. কর্তৃপক্ষ এসিড বিক্রির সময় ক্রেতার পূর্ণ ঠিকানা, ব্যবহারের উদ্দেশ্য লিখিত আকারে সংরক্ষণ করবেন।

৯. এসিডের সহজলভ্যতা রোধকল্পে এসিড বিপণন ও আমদানি-রপ্তানি এবং এসিড ব্যবহারে সরকার কর্তৃক কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

১০. শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই এসিড সংক্রান্ত আইন সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা ফলপ্রসূ হবে।

১১. এসিড আক্রান্তদেরকে এসিড সংক্রান্ত আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনকল্পে তথা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ে আরো বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

১২. এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সোনালী উৎকর্ষের যুগে এসে মানুষ হিসেবে মানুষকে এসিড নিক্ষেপ বর্বরতার শেষ সীমা বলে মনে হয়। বিশ্ব জনমত আজ যেখানে মানবাধিকার ও মানবতার প্রশ্নে সোচ্চার সেখানে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদতার কথা ভাবা যায় না। বরং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পুরুষের পাশাপাশি নারী-শিশুর অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

নারী-শিশুর উপর এসিড নিক্ষেপের মত বর্বরোচিত ঘটনা যদি ক্রমবর্ধমান হারে ঘটতে থাকে তবে আর সার্বিক উন্নয়ন নয় বরং মানুষ হিসেবে নারীর মূল্য ও অবদানকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাকে বঞ্চনায় নিপতিত করা হয়। এ কথাও সত্য যে, আজ এসিড নিক্ষেপ শুধু নারীর উপর সীমাবদ্ধ নয়, নারীর পাশাপাশি শিশু এবং পরিবারের পুরুষ সদস্যারও এর শিকার হচ্ছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পুরো পরিবারই পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। তাই জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় টিকে থাকার প্রশ্নে এই এসিড সন্ত্রাসকে শুধু নারীদের সমস্যা না ভেবে একটি জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে তা নির্মূলের জন্য আইনবিদ, মানবাধিকার কর্মী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, গবেষক, চিকিৎসক, অন্যান্য পেশাজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসহ সুশীল সমাজস্থ সকলকেই একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

৩.১.২ যৌন হয়রানী ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্ম ক্ষেত্রে

মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ও নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সমাজ। সভ্যতা যে কোন সমাজের অবস্থা নির্ণয়ের একটি উপায় হলো, সমাজে নারী-শিশুর অবস্থা নিরূপণ করা। স্বাভাবিকভাবে নারী-শিশুর মর্যাদা ও আচরণ সমাজের গতি নির্দেশ করে। কোন সমাজে ব্যাপকভাবে নারী-শিশু নির্যাতন ঘটতে থাকলে সেই সমাজকে সুসভ্য সমাজ বলা চলে না। অন্যকথায় নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও নারী-শিশুর অধস্তন অবস্থান চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

বহুকাল ধরে নারী-শিশুর উপর সহিংসতা বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই সহিংসতা বেশিরভাগই সংঘটিত হয় পুরুষদের দ্বারা। অশ্লীল মন্তব্য ও আচরণ থেকে শুরু করে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, ট্রাফিকিং বা পাচার ও হত্যা পর্যন্ত বিস্তৃত নারীর প্রতি এই সহিংসতা। সহিংসতার মোট পরিমাণের একটি বড় অংশ হচ্ছে যৌন হয়রানি। যার শিকার সাধারণতঃ নারী ও কন্যা শিশুরা।

Dhaka University Institutional Repository

যৌন হয়রানির আইনগত সংজ্ঞা স্থান ভেদে বিভিন্ন রকমের হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাকে খুবই সংকীর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং যৌন হয়রানি বলতে শুধু অযাচিত যৌন আচরণকে বুঝায়।

প্রচলিত আইনে যৌন হয়রানিকে খুবই সীমিত অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, কেননা এখানে হয়রানি বলতে কেবল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌন প্রকৃতির হুমকিকেই বোঝানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আইন সন্দেহাতীত ভাবে ধারণা করে নেয় যে, মহিলারাই শুধু যৌন শালীণতায় বিপদগ্রস্থ হয়।

ইউরোপিয়ান কমিশন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির এক ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছে, যা এখানে বিবেচনা করা যায়। এখানে যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়, অযাচিত যৌন প্রকৃতির কোনো আচরণ, অথবা অন্য কোনো ধরনের যৌন আচরণ, যা কর্মক্ষেত্রে কোন পুরুষ অথবা নারীর মর্যাদাহানি করে। সব ধরনের দৈহিক, মৌখিক বা অবাচনিক আচরণ এর আওতায় পড়ে। তিনটি শর্ত পূরণ হলে এই কাজগুলোকে যৌন হয়রানি বলা যাবে-

১। কাজটি অযাচিত, অশোভন অথবা অপমানকর;

২। আচরণের গ্রহণ অথবা বর্জন চাকরিকে প্রভাবিত করে;

৩। আচরণটি ঐ ব্যক্তির জন্য কর্মক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতিকর, বৈরী ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা কর্মক্ষেত্রে যথার্থ ও আদর্শ আচরণের নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এখানে উন্মুক্ত স্থানে আচার-আচরণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই তারপরেও ইউরোপিয়ান কমিশনের সংজ্ঞা যৌন হয়রানিকে শুধু যৌনতামূলক আচরণ নয়, নারী বা পুরুষের মর্যাদাহানিকর যে কোন ধরনের যৌন আচরণকে নির্দেশ করেছে। এটা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ এবং সরাসরিভাবে প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার লংঘনকে নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানী Farley (1978)-এর মতে যৌন হয়রানি হলো, "Staring at, commenting upon or touching a women's body, requests for acquiescence in sexual behaviour, repeated non-reciprocal propositions for dates, demand for sexual harassment."[১৩] অর্থাৎ শারীরিক অথবা মৌখিকভাবে যৌন সংসর্গে পৌছানোর চেষ্টাই হলো যৌন হয়রানি। এক কথায় আমরা বলতে পারি, অসম শক্তির সম্পর্কের মাধ্যমে অন্যের নিকট অনভিপ্রেত যৌন চাহিদা আরোপণ করাই হলো যৌন হয়রানি। Kening এবং Ryan (১৯৮৬)-এর মতে, যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করতে ৮ ধরনের আচরণের অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক।[১৪] এগুলো হলোঃ

১। যৌন সম্পর্কিত কৌতুক বা ছবি;

২। যৌন বিষয়ক বিরক্তিকর বা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা;

৩। অপ্রত্যাশিত ও ইংগিতপূর্ন চাহনি বা ইশারা;

৪। অপ্রত্যাশিত চিঠি বা ফোন;

৫। অপ্রত্যাশিত সংকটময় অবস্থায় ফেলা;

৬। অনাকাঙ্খিত স্পর্শ;

৭। প্রেম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা;

৮। যৌন কাজে বাধ্য করা।

---

১৩. Farley, L (1978): *Sexual Shakedown: Sexual Harassment of woman on the Job,* Melbourne House, London/MC. Graw-Hill, New York, P. 38.

১৪. Kening & Ryan, *Sexual Harassment of working women, A case of sex Discrimination,* yale University, Press, New Haven, Cann, P. 90.

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি উইমেন ফর উইমেন (২০০৩) নামক একটি সংগঠন যৌন হয়রানির একটি সংজ্ঞা দেয় যা যৌন হয়রানিকে যৌন নির্যাতন বা নিপীড়ন থেকে পৃথক করতে সহায়তা করে। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যৌন হয়রানির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ঃ[১৫]

- যে কোন ধরনের অবাঞ্ছিত শারীরিক সংস্পর্শ;
- জোরপূর্বক ভালবাসা ঘোষণা ও সম্মতি আদায়ে হুমকিধামকি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন;
- যৌন-রসাত্মক ইঙ্গিত;
- যৌন-ইঙ্গিতকারক ছবি ইত্যাদি প্রদর্শন;
- যৌনাঙ্গ প্রদর্শণ;
- যৌন প্রকৃতির অন্যান্য অবাঞ্ছিত শারীরিক, বাচনিক ও অবাচনিক আচরণ (চাহনি, ভঙ্গি, উক্তি থেকে শুরু করে গায়ে হাত দেয়া ঠেসে দাঁড়ানো, চিমটি কাটা, লিখিত ইঙ্গিত ইত্যাদি)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বলা যায় অশালীন যৌন কটুক্তি, শারীরিক স্পর্শ, অশ্লীল অংগভঙ্গী, স্পর্শকাতর অংগে স্পর্শ করা, ধাক্কা দেয়া, চিমটি কাটা, যৌনাঙ্গ প্রদর্শনপূর্বক বিপরীতলিঙ্গের সদস্যকে বিপর্যস্ত ও উত্ত্যক্ত করাই হচ্ছে যৌন হয়রানি। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে, এই হয়রানি মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এছাড়া এই হয়রানির বিস্তৃতি সমলিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যেও বিদ্যমান।

১৫. উইমেন ফর উইমেন-২০০৩, *বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানী মোকাবেলা সংক্রান্ত নীতিমালা (অপ্রকাশিত)*, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

যৌন নির্যাতনের মতো যৌন হয়রানিতে বাহ্যিক কোন লক্ষণ না থাকায় এতে আক্রান্ত মেয়েদের সমাজে বেশ বিপদে পড়তে হয়। সে মানসিক এবং সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা মেয়েটির আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানে ও সামাজিক মর্যাহানি ঘটায় ও নিজের প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ নারায়নগঞ্জের সিমি[১৬] এবং খুলনার রুমী[১৭] আত্মহত্যাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এ দুটি উদাহরণ আমাদের সমাজে সংঘটিত যৌন হয়রানির তীব্রতাকে বোঝাতে সক্ষম। কেননা, এরা জীবন দিয়ে যারা এই হয়রানির শিকার তাদের অনুভূতি এবং মানসিক অবস্থা সমাজের কাছে তুলে ধরেছে এবং প্রতিবিধানের দাবি জানিয়ে গেছে।

যৌন হয়রানি সমাজের সকল স্তরে বিদ্যমান। শিক্ষিত সমাজে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও যৌন হয়রানি প্রকটভাবে বিদ্যমান। উচ্চ শিক্ষার্থে আসা তরুণীরা তাদের বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত এবং কতিপয় শিক্ষকদের দ্বারা এই হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। অন্য দিকে ছেলেরাও মেয়েদের দ্বারা, পাশাপাশি সমলিঙ্গের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়। যেহেতু কর্মের তাগিদে অথবা উচ্চশিক্ষার্থে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে সেহেতু তাদের যত্রতত্র যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা থাকে যা অন্যান্য গৃহে অবস্থানকারী মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই এদের নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মেয়েদের যৌন হয়রানি সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে আরেক ধরনের হয়রানির চিত্র আমরা দেখতে পাই যা টিনএজারদের দ্বারা মুঠোফোনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এর প্রভাব আমরা পত্রিকা খুললেই দেখি যে প্রতিনিয়তই ঘটছে নানা অবাঞ্জিত ঘটনা যার শিকার হচ্ছে সাধারণতঃ মেয়েরা।

---

১৬. ২৩-১২-২০০১এ নারায়নগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী সিমি সন্ত্রাসীদের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নে। (সূত্রঃ ২৪-১২-২০০১, দৈনিক প্রথম আলো)।

১৭. খুলনার রুমি ১৪-০৪-২০০৩ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহননের পথ বেছে নেয় (সূত্রঃ ০৫-০৬-২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো)।

Dhaka University Institutional Repository

যৌন হয়রানির ফল সুদূরপ্রসারী। যারা যৌন হয়রানির শিকার হয় তারা সামাজিক দিকের কথা চিন্তা করে এ ধরনের হয়রানির গ্লানি নীরবে সয়ে যায় এবং ধীরে-ধীরে নিজের মাঝে এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে লালন করে থাকে যা তাদের ব্যক্তিত্বে চরম বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। যৌন হয়রানির ফলে যেসব মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলোর মধ্যে বিষন্নতা, উদ্বেগ, মানসিক আঘাত, নিরাপত্তাবোধহীনতা ভীতি, লজ্জা, হীনমন্যতাবোধ, নিজের প্রতি দোষারোপ, অপরাধবোধ প্রভৃতি প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মতানুসারে যৌন হয়রানির কারণসমূহের পৌনঃপূণ্য শতকরা হার এবং ক্রমমান।[১৮]

কারণসমূহ	ছাত্র (১৫০)			ছাত্রী (১৫০)		
	পৌনঃ পুন্য	শতকরা হার	ক্রমমান	পৌনঃপুন্য	শতকরা হার	ক্রমমান
পুরুষদের বিকৃত মানসিকতা	৯৩	৬২	৪	১৪৮	৯৮.৬৭	১
আকাশ-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব	১২৫	৮৩.৩৩	১	৯৪	৬২.৬৭	৫
আইনের সঠিক প্রয়োগে অব্যবস্থাপনা	৮১	৫৪	৫	১১৭	৭৮	৩
পরিবারের পরিবেশগত ত্রুটি	৬৮	৪৫.৩৩	৭	৮৬	৫৭.৩৩	৭
সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়	১১৪	৭৬	৩	১১৮	৭৮.৬৭	২
উপযুক্ত যৌন শিক্ষার অভাব	৭৬	৫০.৬৭	৬	৬৯	৪৬	৮
যুব সমাজের বেকারত্ব	৪৯	৩২.৬৭	১০	৪৪	২৯.৩৩	১১
মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি	৩৩	২২	১২	৯১	৬০.৬৭	৬
অশ্লীল দৃশ্য-সম্বলিত ছবির অবাধ প্রাপ্তি ও প্রদর্শন	১১৭	৭৮	২	১১২	৭৪.৬৭	৪
সঠিক ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব	৫৫	৩৬.৬৭	৯	৪৭	৩১.৩৩	১০
সামাজিকীকরণের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের অনুপস্থিতি	৪২	৩০.৬৭	১১	২৮	১৮.৬৭	১২

১৮. উইমেন ফর উইমেন এর পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের মোট ৩০ জন (১৫ ছেলে ও ১৫ মেয়ে) ছাত্র-ছাত্রীর উপর এ জরীপ চালানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যায়, প্রশ্নে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরও দুটি কারণকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ দুটি হচ্ছে-

১। সঠিক ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব;

২। সমাজিকরণের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের অনুপস্থিতি।

মোট ১৩টি কারণের মধ্যে মেয়েরা "পুরুষদের বিকৃত মানসিকতা" এবং ছেলেরা "আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাবকে" যৌন হয়রানির কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি চিহ্নিত করেছে, যার হার যথাক্রমে ৯৮.৬৭% এবং ৮৩.৩৩%। অর্থাৎ মেয়েরা, ছেলেদের কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণকে এই হয়রানির প্রধান কারণ এবং ছেলেরা টি.ভি, রেডিও প্রকাশনা, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বাহ্যিক সংস্কৃতির প্রভাব এই হয়রানির মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে করে।

প্রতিদিন খবরের কাগজে যে সব নির্যাতনের ঘটনার উল্লেখ থাকে তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছে কর্মজীবী নারী। এর মধ্যে গার্মেন্টস কর্মী ও গৃহপরিচারিকার সংখ্যাই বেশী। গত জুলাই ২০০০ সাল থেকে মার্চ ২০০১ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী ১১৫ জন কর্মজীবী নারী নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৮ জন ধর্ষণ, ২৮ জন খুন ও ১৯ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার। খবরের কাগজে সাধারণত: এলাকার বহুল আলোচিত খবরই প্রকাশ পায় না। কাজেই এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রকৃত নিপীড়নের ঘটনা আরও ব্যাপক।

সংবাদপত্রে আরও যে সব খবর প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবনের ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা। গত কয়েক বছরের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে ২০০ জন মহিলা শ্রমিক গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছে, প্রায় এক হাজার জন আহত হয়েছে। যদিও মালিকেরা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করেছে কিন্তু শ্রম আইনের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। সংবাদপত্রে পোষাক কারখানা কর্তৃক শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ, শ্রমিকের আর্থসামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। এ অভিযোগগুলি বিশেষ করে নারী শ্রমিকের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগগুলি সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে দারুণভাবে।[১৯]

১৯. Ain-o-Shalish Kendra, 2000, *Safety and health rgulation in garment factories in Bangladesh.* Dhaka: ASK, 2001, P.16.

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি সহিংতার চিত্র তুলে ধরার জন্য গুটি কয়েক সমীক্ষা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে গার্মেন্টসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশী সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হয়। তারা যে ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয় তার মধ্যে অপ্রীতিকর মন্তব্য, কথায় কথায় গালি দেওয়া, লোক সম্মুখে হেয় করা, গায়ে হাত দেওয়া, জড়িয়ে ধরা, অন্যান্য শারীরিক আক্রমন এবং প্রহার। চাকুরী হারাবার ভয়, সামাজিক ভাবে অসম্মানিত হওয়া আত্মসচেতনতার অভাবের জন্য প্রতিবাদ করে না। তারা জানে না কোথায় গেলে আইনের শরণাপন্ন হওয়া যাবে। সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মত আত্মবিশ্বাসেরও অভাব রয়েছে।

সহিংসতার শিকার নারীর পরিবারে যেমন তার স্থান নেই, কর্মক্ষেত্রেও তার পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। তাকে চলে যেতে হয় কোন অপরিচিত জায়গায়। যেখানে সে হয়ে যায় নাম ঠিকানা বিহীন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী কাজ নেয় নতুন কোন কলে কারখানায়। নতুন একটা নামকরণ হয় তার। কারণ পুরোনো নামের সাথে ধর্ষিতা শব্দটি হয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে সে থাকে বিচ্ছিন্ন। কর্মক্ষেত্রে, রাস্তায়, কিংবা গৃহে যেখানেই নারী নির্যাতিত হোক না কেন এর প্রতিকার চাইতে গিয়েও তারা মুখোমুখি হচ্ছে আরও বিড়ম্বনার। এদের চিকিৎসা ব্যবস্থা চাকুরী স্থলেও যেমন নেই তেমনি শ্রমজীবী মহিলারা জানেও না কোথায় সুচিকিৎসা পাওয়া যায়। উপরন্ত এদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও অপ্রতুল। চিকিৎসার পর আইনগত ব্যবস্থা নিতে গিয়েও মহিলাদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় রীতিনীতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, নারী কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ আশা করলেই তাকে লাঞ্ছনার, অবমাননার এবং অধিকতর হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।[২০]

বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের এ সব পদক্ষেপের কারণে নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নারী

২০. নারীপক্ষ, *নারীর জন্য আইনঃ প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতা, অবস্থানপত্র নারী সংগঠন সমূহের প্রথম নারী সম্মেলন*, শ্রাবন ১৪০২, জয়দেবপুর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ করে অধিক সংখ্যক নারীকে নিয়োগ দিচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের ফলে নারীদের স্ব-নিয়োজিত কর্ম বেড়েছে কয়েকগুন। তাছাড়া রপ্তানীমুখী উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশে পোষাক শিল্প নারীদের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার পুরুষের চাইতে অনেক কম। তাছাড়া নারীদের যতটুকু নিয়োগ হয়েছে তাও আবার বেশির ভাগই সীমাবদ্ধ রয়েছে গুটি কয়েক ঝুঁকিপূর্ণ ও কম মজুরির পেশাগুলিতে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পর্যায়ে মহিলাদের উপস্থিতি প্রান্তিক পর্যায়ে এবং পলিসি প্রণয়ন কমিটিতে নারীদের উপস্থিতি একেবারে নেই বললেই চলে ।

নারী শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ফলে তার ব্যক্তি জীবনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি, দুর্ঘটনা ঝুঁকি, নানারূপ সম্ভ্রম ও যৌন হয়রানির ঝুঁকি ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে নারী শুধু শোষণ ও বঞ্চনার শিকারই নয়, তারা নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হচ্ছে প্রতিদিন। আমাদের বর্তমান গবেষণার কেস স্টাডি ও গ্রুপ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মহিলা কর্মীরা দুটো প্রধান সহিংসতার শিকার হয় এগুলো হচ্ছে ১) মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, ২) হয়রানি বিশেষ করে যৌন হয়রানি। বিভিন্ন ধরনের মৌলিক অধিকার লংঘন, হয়রানি ও সহিংতার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলঃ

১. মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন

এ গবেষণায় নারী শ্রমিকদের রিপোর্ট অনুযায়ী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম বেতন থেকে বঞ্চিত করা সাপ্তাহিক নৈমিত্তিক ও মেডিকেল ছুটি না দেয়া কখনও কখনও দু'তিন মাসের বেতন না দিয়ে শ্রমিক ছাটাই, প্রাপ্য অনুযায়ী বেতন না দেয়া, ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ না করা, মাতৃত্বজনিত ছুটি না দেয়া, ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়ে তালাবদ্ধ করে রাখা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় অগ্নিকাণ্ড, অস্বাস্থ্যকর কর্মস্থল মারধর কখনও কখনও সজোরে আঘাত করা, হত্যা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২) হয়রানি বিশেষ করে যৌন হয়রানি

কর্মজীবী নারী হয়রানি এবং বিশেষ করে যে সমস্ত যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে তা হচ্ছেঃ মৌখিক আচরণ-বকাবকি করা, লোক সম্মুখে হেয় করা, ব্যঙ্গপূর্ণ মন্তব্য করা, অশ্লীল/নোংরা গালি-গালাজ করা, বিদ্রুপ/পরিহাস করা, যৌনকাজের জন্য অর্থ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া, অবাচনিক আচরণ, অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হওয়া, জড়িয়ে ধরা, অশ্লীল ছবি দেখানো, হীন আচরণ করা, গোপন ইঙ্গিত করা, চোখ দ্বারা কুরুচিপূর্ণ ইশারা করা ইত্যাদি। এ ছাড়াও নারী সহিংসতা যেমন ধর্ষণ, খুন, হত্যা ও দৈহিক আক্রমনেরও শিকার। এ গবেষণায় কর্মজীবি নারীরা ব্যক্তিগত ভাবে যে সমস্ত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তা কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো[২১]ঃ

হাসপাতালের নার্স

শীলা, বয়স-২৪, সরকারী হাসপাতালের নার্স প্রায়ই রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা পরিহাসের শিকার। তারা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যও করে। কেউ কেউ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। পুরুষ নার্স, ওয়ার্ডবয় ও তাকে বিরক্ত করে। কেউ কেউ তাকে প্রেম করারও প্রস্তাব দেয়। সে হাসপাতালের ভিতরে মাস্তান দ্বারা উত্যক্তও হয়েছে। মাস্তান তাকে অপহরণ করবে বলে শাসিয়েছে। বেশীর ভাগ অল্পবয়সী নার্স এবং ছাত্রী নার্সরা এ ধরনের হয়রানির শিকার।

গর্মেন্টস মহিলা শ্রমিক

রুমা, বয়স-১৮, একজন অল্পবয়সী গার্মেন্টস শ্রমিক। সে অপারেটর হিসাবে গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। কয়েক বছর আগে যখন সে গার্মেন্টেসে কাজ করতে আসে তখন কাজে একটু আধটু ভূল হলেই তাকে মারধোর করা হত। তার পুরুষ সুপারভাইজার দ্বারা প্রায়ই যৌন হয়রানি যেমন গালে পিঠে হাত দেয়া এবং প্রেম করার প্রস্তাব দেয়া, তার কোন কোন পুরুষ সহকর্মীরা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সে বলেছে যে, তার সুপারভাইজার, লাইন চিফ, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসিসট্যান্ট প্রায়ই তাকে বিরক্ত করে।

২১. গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকারগুলি ০৩-০১-২০০৭ইং তারিখে গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেলস গার্ল

রীনা, বয়স-২০বছর, একটি শপিং মলে হ্যান্ডিক্রাফট ও কসমেটিকস এর দোকানে ২ বছর যাবত সেলস গার্ল হিসাবে কাজ করে। সে প্রায়ই কাস্টমার কর্তৃক বিদ্রুপ ও পরিহাসের শিকার হয়। তার বাবা বয়সী কাস্টমাররা তাকে কখনও চোখ দ্বারা কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করে, জিহ্বা দেখায়, কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা বলে। অল্প বয়সী কাস্টমাররা অশালীন কথাবর্তা বলে, ওড়না ধরে টান দেয়, চুলে টান দেয়, শিস দেয়, পাশ দিয়ে যেতে গায়ে ধাক্কা দেয়। বাইরের কিছু কিছু বখাটে ছেলে টিপ্পনী কাটে এবং ব্যঙ্গপূর্ণ মন্তব্য করে। তাকে অন্য দুই/তিনটি শপিং সেন্টার এবং পাইকারী বিক্রয়ের মার্কেট থেকে দোকানের জন্য মালামাল ক্রয় করতে হয় সেখানে তাকে গায়ে হাত দেয়া, জিহ্বা দেখানো, টিপ্পনী কাটা, শরীর সম্পর্কে বাজে মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। অন্য মার্কেট থেকে জিনিস কিনে দোকানে ফেরার পথে কয়েকবার তার মালামাল ছিনতাই ও হয়েছে। একবার দোকানের চাবিসহ ছিনতাইও হয়েছে। ছিনতাই হওয়ার পর সে খুব ভয় পেয়েছে। প্রথম বার ছিনতাইয়ের পর কয়েকদিন দোকানে কাজ করতে পারেনি। পরবর্তী ছিনতাইগুলোর পর ভয়ে ভয়ে কয়েকদিন কাজ করে পরে স্বাভাবিক হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিক

আলেয়া, বয়স-৩০বছর, নির্মাণ শ্রমিক। ২ বছর যাবত কাজ করছে। প্রথম দিন কাজে এসেই সে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। কন্ট্রাকটর প্রথমদিনই তার গায়ে হাত দিয়েছে। এমনভাবে তাকিয়েছে যেন সে একজন দেহ পশারিনী। যখন সে একা এক জায়গায় কাজ করে অথবা নির্মানের মালামাল মাথায় নিয়ে বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে তখন কন্ট্রাকটার তার গায়ে হাত দেয়। অযথা উত্যক্ত করা হয় তাকে। এদিকে স্বামীও তাকে নির্যাতন করে।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহপরিচারিকা

বাংলাদেশের গ্রাম কিংবা শহরাঞ্চলের সচ্ছল মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারে সাংসারিক কাজে সাহায্য করার জন্য সহকারী হিসেবে কিশোর-কিশোরী, মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এরা এসব পরিবারের সদস্য নয়। পেটে-ভাত, বছরে দুই-তিন প্রস্থ কাপড় কিংবা ন্যূনতম নগদ টাকার বিনিময়ে এরা এসব কাজের সাথে যুক্ত হয়। এসব ব্যক্তিকেই গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমনঃ গৃহশ্রমিক, গৃহকর্মী, গৃহভৃত্য, গৃহসহায়িকা, গৃহপরিচারক অথবা পরিচারিকা। কখনও বা এরা কাজের লোক বা কাজের মেয়ে, চাকর বা চাকরানি আবার কখনও ঝি, আয়া, খালা নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে এরা 'বুয়া' নামেই অত্যধিক পরিচিত। আজকের আধুনিক যুগে সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে পাল্লা দিয়ে এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছে। বিশেষ করে একক পরিবার ও চাকরিজীবী স্বামী-স্ত্রীর সংসারে গৃহপরিচালনার জন্য এক অপরিহার্য উপাদান হলো গৃহশ্রমিক। এসব আলোচনাকে বিবেচনায় রেখে সংক্ষেপে বলা যায়, গৃহকর্মে গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করা অথবা কোনো বাসা বা মেসে রান্নাসহ যাবতীয় কাজ করার জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত নারী, পুরুষ শিশুরাই হলো গৃহশ্রমিক।

আধুনিক পরিবারে বিশেষতঃ শহর এলাকায় গৃহশ্রমিক অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত। মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক ব্যস্তজীবনের সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে এই গৃহশ্রমিক। এদেরকে গৃহস্থালির নানাবিধ কাজ প্রতিনিয়তই করতে হয়। যেমনঃ ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, বাজার করা, বাচ্চার যত্ন নেওয়া প্রভৃতি। এসব দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েই গৃহশ্রমিকরা হচ্ছে শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। নির্যাতনের মাত্রা কেবল চরমে পৌঁছলেই তা সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত হয়, সুশীল সমাজের বক্তৃতা-বিবৃতির উপকরণ হয়। কিন্তু পত্রিকার নিউজ হওয়ার পূর্বে এদের উপর যে নির্যাতন হয় তা কেউ খবর রাখে না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি'র তথ্য মতে,[২২] ২০০৪ সালে সারা দেশে মোট ১২১ জন গৃহশ্রমিক বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়। এদের মধ্যে ৩৩ জন শারীরিক নির্যাতন, ২৬ জন খুন, ১৮ জন ধর্ষণ, ১ জন গণধর্ষণ, ১০ জন ধর্ষণের পর খুন, ২ জন আগুনে পুড়ে হত্যা, ১১ জন অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয় এবং ২ জন আত্মহত্যায় বাধ্য হয়। নির্যাতনের শিকারদের বেশিরভাগের বয়সই ১৮ বছরের নিচে। অন্যদিকে, 'ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার'-এর সূত্রমতে, ২০০৪ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই দুইমাসে ১৯ জন গৃহপরিচারিকা নির্যাতিত হয়। এর মধ্যে ৯ জন নিহত এবং ১০ জন আহত। অথচ এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ৭টি এবং গ্রেফতার হয়েছে মাত্র দুইজন। গৃহকর্ত্রী কর্তৃক নির্যাতন আজ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে, সামান্য কারণে বকা-ঝকা দুই একটি চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে গরম খুন্তি-ইস্ত্রি দিয়ে কাজের ছেলে বা মেয়ের শরীর পুড়িয়ে দেওয়া বা ছেঁকা দেওয়ার মতো শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা অহরহ আমরা পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই। দুঃখের বিষয় হচ্ছে কাজের লোকের উপর যারা নির্যাতন করে তারা রাস্তায় ঘুরেবেড়ানো কোনো পেশাদার অপরাধী নয়, বরং শিক্ষিত সমাজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো পরিবারের সদস্য। কাজের মেয়ে নির্যাতন বা হত্যা এবং সেই অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় গৃহকত্রী-কর্তাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য এমনকি ছেলেমেয়েরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব বিকৃত ও অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষগুলো সমাজে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই বসবাস করে বলে তাদের ঘরের চারদেয়ালের অভ্যন্তরে কি বিভীষিকা ঘটে যাচ্ছে সেটা বাইরের মানুষ সহজে বুঝতে পারে না।

গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহতার আর একটি দিক হলো শিশুশ্রমিকদের উপর নির্যাতন। 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি'র এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে ২০০৪ সালে নির্যাতিত ১২১ জন গৃহশ্রমিকের মধ্যে সর্বাধিক ৭৪ জনের বয়সই ৭-১৮ বছরের নিচে এবং ১ জনের বয়স ৬ বছরের নিচে।

২২. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক পরিচালিত জরীপ-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান[২৩] থেকে জানা যায় যে, ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০০৩ পর্যন্ত মাত্র ৪ মাসে ১৫ জন গৃহকর্মী শিশু নিয়োগকর্তাদের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে এবং বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে আরো ৮ জন শিশু। এছাড়া সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত দেশের জাতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই চার বছরে সারাদেশে নির্যাতনের ফলে ৫-১৫ বছর বয়সের শিশু আহত হয়েছে মোট ৭৪ জন, নিহত হয়েছে ৭২ জন, ধর্ষিত হয়েছে ২৫জন। যা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়।

শুধু শারীরিক বা যৌন নির্যাতন নয়, কাজের-মেয়ের উপর মানসিক নির্যাতনও একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সামান্য কারণেই অকথ্য গালিগালাজ করা হয়। বাড়ির সদস্যরা বাইরে বেড়াতে গেছে তাদেরকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে যাওয়া হয়। একসাথে গাড়ি বা রিকশায় গেলে কাজের-বুয়াকে রিকশার সীটের নিচে বসতে দেয়া হয়। বাড়ির লোকের পাশাপাশি চেয়ারে বসা, ডাইনিং টেবিলে খাওয়া, খাটে বা সোফায় বসার অনুমতি দেয়া হয় না। শিশু গৃহশ্রমিকের সামনে নিজের সন্তানকে ভালো ভালো খাবার খাওয়ালেও কাজের মেয়েকে সামান্য একটু খাবার দিতে কার্পণ্য করা হয়। আবার ক্ষুধার্ত হয়ে কিছু খেলে খাবার চুরির অপরাধে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। অনেক পরিবারে কাজের মেয়ের সঙ্গে ছোট বাচ্চা নিয়ে আসা পছন্দ করে না বা ছোট বাচ্চা থাকলে কাজ দেয়া হয় না। আর যে কোনো কিছু চুরি গেলে চোর সন্দেহে কাজের-বুয়াকেই মারধর করা হয়। গৃহশ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। আর তাইতো তাদের অবসর-বিনোদন বা বিশ্রাম বলতে কিছু নেই। কাজ না করে এরা বসে থাকবে এটা কারো পছন্দ নয়। তাই সারাক্ষণই একটা-না একটা কাজ তাদের হাতে দেয়া চাই-ই। রাত দিন এদের কাজ করতে হয়। তাদের সঙ্গে আগেকার দিনের দাসদের মতো ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে অধিকাংশ গৃহকর্মী, বিশেষ করে শিশু গৃহকর্মীরা দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করে।

২৩. আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত জরীপ-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

এদের উপর পুরো পরিবার এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, পরিবারের সদস্যরা গোসলের পর নিজের কাপড় পর্যন্ত ধুয়ে দেয় না। এমনকি ফ্যানের সুইচটি পর্যন্ত চাপ দেয় না। বাড়ির এত কাজ যাকে করতে হয় তার হাত দিয়ে কোনো জিনিস পড়ে গিয়ে যদি ভেঙ্গে যায়, কোনো খাবার যদি সে খায় তাহলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। বেতনের টাকা কাটা, গালাগাল ও মারধর থেকে শুরু করে যত রকম অত্যাচার করা সম্ভব তার সবই করা হয়। গৃহশ্রমিকদের খাওয়ার দৃশ্যপট আরো অমানবিক। প্রতিবেলার খাওয়ার সময় বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে বুয়াদের খেতে দেয়া হয় সবার পরে। আলাদা জায়গায়, আলাদা খাবার দিয়ে। যদিও ভালোভালো খাবারগুলো তাদের হাতেই তৈরি হয়। তারপরও বেশিরভাগ সময় তাদের ভাগ্যে জোটে বাসি-পচা বা এঁটো-কাঁটাযুক্ত খাবার। স্বাভাবিক নিয়মে সবার জীবন চললেও গৃহশ্রমিকদের জীবন চলে ভিন্ন নিয়মে। আর তাইতো সাপ্তাহিক, সরকারি ছুটি, হরতাল বা বিশেষ দিনগুলোতে ছুটি নেই তাদের। একদিনের জায়গায় দুইদিন কাজে না গেলেই গৃহকর্ত্রী বিনা নোটিশে অন্য কাজের-লোক নিয়োগদানের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং গৃহশ্রমিকদের কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাইতো অনিশ্চিত ও অমানবিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয় তাদের দৈনন্দিন জীবন।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের নানাবিধ প্রভাব রয়েছে। এটি নির্যাতিত নারী, তার পরিবার, সমাজ ও সার্বিকভাবে নারী নিরাপত্তার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গবেষণায় এধরনের নির্যাতনের নানাবিধ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতনের প্রভাব এবং এর পরিণতিকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে-

Dhaka University Institutional Repository

গৃহকর্ম নিয়োজিত নারীদের উপর নির্যাতনের ফলাফল

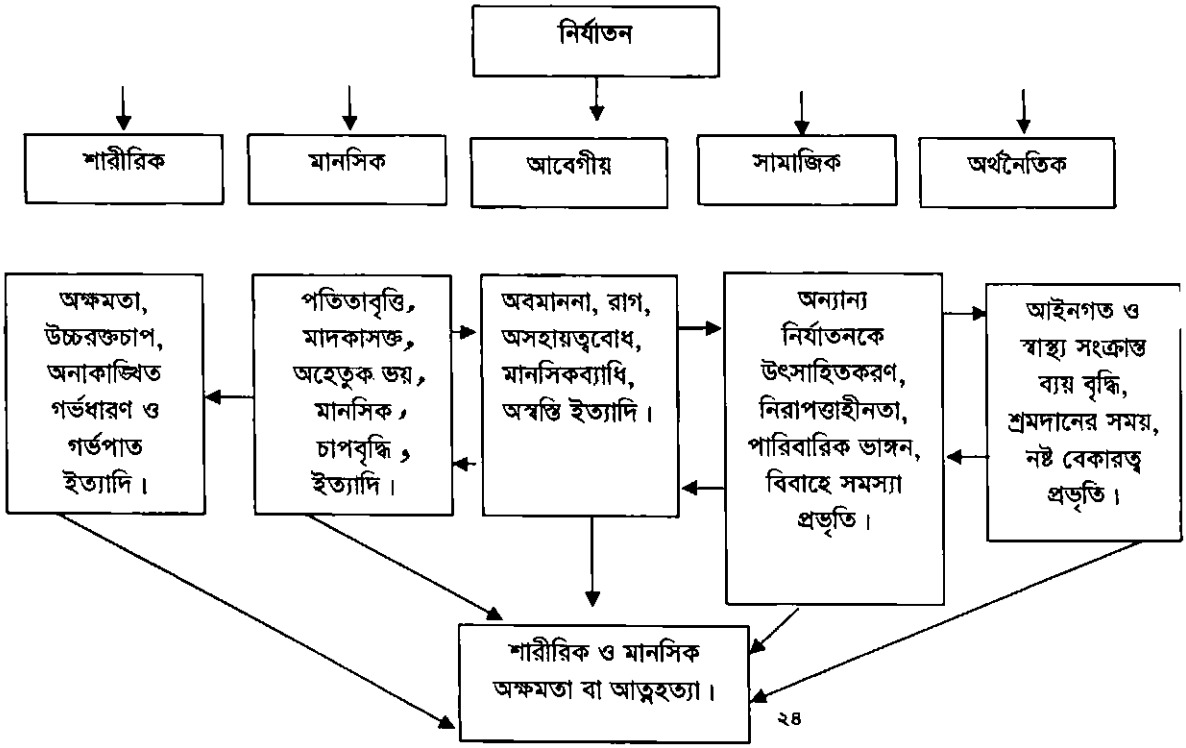

২৪

২৪. ছকটি Md. Rabiul Islam, *Recent ftends and consequenes of Rape in Bangladesh. A study on violence Against women and Adorescent Girls'*, *Social Science Journal,* Faculty of Social Science. University of Rajshahi, Vol, 9, July 2004. p. 130-এর অবলম্বনে পুনগঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চিত্র থেকে প্রতীয়মান যে, গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীদের উপর নির্যাতনের বহুবিধ প্রভাব ও ফলাফল রয়েছে। নারীর শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র সহ-সম্পর্কে সম্পর্কযুক্তই নয় বরং এদের নেতিবাচক একটির প্রভাব অন্যটির উপর বিদ্যমান (overlap)। এই ফলাফলসমূহ নির্যাতিতদের জীবনে আরো নেতিবাচক ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি করে যা শেষপর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতায় রূপলাভ করে। এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত ও গড়াতে পারে।

গৃহশ্রমিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি পর্যায়ে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

I.L.O-র গৃহকর্মীদের কাজের শর্তাবলী প্রয়োগের সাধারণ মান সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন ও সুপারিশমালা স্মরণে রেখে ১৯৯৬ সালের ২০ জুন 'হোম ওয়ার্ক কনভেনশন- ১৯৯৬' গৃহীত হয়। এই কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-৪ এর ২ ধারায় বলা হয়েছে, গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের পছন্দ মতো কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা কোনো সংস্থায় যোগদান এবং এই ধরনের সংস্থার কর্মকাণ্ডে সেচ্ছায় অংশগ্রহণের অধিকার; চাকরিতে বা পেশার বৈষম্য থেকে রক্ষার অধিকার; পারিশ্রমিক পাবার অধিকার; সংবিধিবদ্ধ সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা অধিকার। উক্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লেখ রয়েছে, আইন, বিধি, যৌথ চুক্তি, সালিশ-নিস্পত্তি অথবা জাতীয় প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো উপায়ের মাধ্যমে গৃহকর্ম সম্পর্কিত জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।[২৫] অবশ্য বাংলাদেশ সরকার এখনো এগুলো অনুসমর্থন করেনি।

২৫. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, *বিলস বুলেটিন*, ঢাকাঃ অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি উদ্যোগ

১৯২৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় জারিকৃত বিভিন্ন শ্রম-আইন বিধিবিধান বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত থাকলেও কোন শ্রম-আইনই গৃহকর্মীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, দণ্ডবিধি ১৮৬০ এবং শিশু-আইন ১৯৭৪ গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। এগুলোর অধীনে গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত শোষণ পাচার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, হত্যা,ধর্ষণ, যৌনপীড়ন ইত্যাদি নানাবিধ নির্যাতনের জন্য নগদ ৩০০ টাকা জরিমানা বা ১ বছরের জেল থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি র ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান আছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্যাতিত নারীদের সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' (ওসিসি) চালু করেছে। ডেনিশ সরকারের সহায়তায় পরিচালিত এই সেন্টার থেকে নির্যাতিত নারীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা, আইনগত সহায়তা ও আর্থিক সমর্থন প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজন সহায়তা প্রদান করা হয়। এখানে নির্যাতিত গৃহশ্রমিক নারী ও শিশু নিয়োগকর্তার বাসা থেকে পালিয়ে বা উদ্ধার হয়ে চিকিৎসা ও আইনগত সাহায্য পাওয়ার আশায় ভর্তি হয়। এদের বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যায়। আবার কাউকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।[২৬]

এনজিও উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক ও সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পর্যায়েও নানাবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন এনজিও এবং মানবাধিকার সংগঠন গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত করা সহ সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে-

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশব বাংলাদেশ[২৭]

এই এনজিও ১৯৯১ সাল থেকে গৃহে কর্মরত শিশুদের জন্য কাজ করছে। এটি গৃহশ্রমিক ফোরাম গঠন করেছে যাতে গৃহশ্রমিকরা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করতে পারে এবং নিজেরা সংগঠিত হতে পারে। এছাড়া গৃহশ্রমিকদের কতিপয় অধিকার নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়ে এ সংগঠন ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এদের দ্বারা পরিচালিত ৮৮টি শিশুকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০২ সাল পর্যন্ত ২২০০ শিশু গৃহশ্রমিককে শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে।[২৮]

আইন ও সালিশ কেন্দ্র[২৯]

এ সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি এটি শিশুশ্রমিকদের জন্য ৪টি 'ড্রপ-ইন-সেন্টার' খুলেছে। এসব সেন্টারে স্থানীয় গৃহশ্রমিক শিশুরা প্রতিদিন দু'ঘন্টার জন্য মিলিত হয়। আনন্দঘন পরিবেশে অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে নিজেদের সুযোগ সুবিধার কথা আলোচনা করে। উক্ত ইউনিট গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে যা থেকে বেরিয়ে এসেছে মূল্যবান সুপারিশ।[৩০]

সুরভী[৩১]

ঢাকা শহরে অধিকারবঞ্চিত শিশুদের জন্য পরিচালিত স্কুল 'সুরভী' বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এখানে একদিকে যেমন অনেক কর্মজীবী শিশু শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ পাচ্ছে তেমনি অনেক নিয়োগকর্তাও তাদের গৃহেকর্মরত শিশুকে এই স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন।[৩২]

---

২৭. শৈশব বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় ঃ ২১/২, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
২৮. শৈশব বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ২০০৩ সালের শৈশব বাংলাদেশের প্রতিবেদনে।
২৯. আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর প্রধান কার্যালয়ঃ ২৬/৩, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা।
৩০. আইন ও সালিশ কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বার্ষিক রিপোর্টে।
৩১. সুরভী এর প্রধান কার্যালয় ঃ ধানমন্ডি-৫, ঢাকা।
৩২. সুরভীর বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসেফ বাংলাদেশ[৩৩]

ইউসেপ বাংলাদেশ- এর স্কুলের মাধ্যমে গৃহশ্রমিক বিশেষত শিশুশ্রমিক ও সুযোগবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও ইউসেপ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ অধিকার সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহন করেছে।[৩৪]

নারী-শিশু নির্যাতন নারী-শিশু সমাজের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। তাদের স্বাধীনতা হচ্ছে খর্ব। প্রগতির পথ হচ্ছে কন্টকাকীর্ণ এবং ব্যাহত হচ্ছে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এমনতর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড চালানো এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে নারী-শিশুর সামনে যে বাধাগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বাধাই হলো নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা। সুতরাং দেশের সার্বিক কল্যাণ ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন করতে হলে নারী-শিশুদেরকে সকল প্রকার নির্যাতন ও শোষণ থেকে মুক্ত করে উন্নয়নের মূলস্রোতধারার সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর এ বিষয়ে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে সকল প্রকার নির্যাতন, বঞ্চনা, শোষণ, বৈষম্য থেকে মুক্ত করা ও এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের জন্য বর্তমান গবেষণার আলোকে প্রদত্ত নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৩৫]

---

৩৩. ইউসেফ বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় ঃ প্লট-২/৩, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।

৩৪. ইউসেফ বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ইউসেফ বাংলাদেশ এর বার্ষিক রিপোর্টে।

৩৫. আফরোজা আখতার, *ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-৮*, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ২০০৬, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক) গৃহশ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের চাহিদা, সমস্যা তথা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরতে পারে এবং নিয়োগকর্তার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে। এছাড়া এটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট ও ন্যূনতম বেতন কাঠামো, ছুটি, ওভার টাইমসহ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে পারে।

খ) গৃহশ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং বর্তমান আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া শ্রমনীতি বা আইন প্রণয়ন করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে নির্দেশিত বিধানসমূহ যেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

গ) বিভিন্ন গণমাধ্যম মারফত সমষ্টিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে কেউ গৃহশ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন না করে এবং নির্যাতিতদের পাশে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এক্ষেত্রে সরকারি ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমষ্টিক জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের একত্রে কাজ করা প্রায়োজন।

৩.১.৩ ধর্ষণ

বর্তমানে বাংলাদেশে অপরাধজগতের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে নারী-শিশু ধর্ষণ। সকল শ্রেণীর, সকল গোত্রের নারীরাই এ ধরনের সহিংসতার শিকার। কখনও স্বামীর সামনে, কখনও পিতা-মাতার সামনে, কখনও বা নিজ পুত্র-কন্যার সামনে গৃহবধূ ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। ধর্ষণ, লাঞ্ছনা, নিপীড়নের ঘটনা কখনও গৃহাভ্যন্তরে, কখনও কলকারখানায়, রেলস্টেশনে, কখনও বা ধানক্ষেতে, এমন-কি কবরস্থানে সংঘটিত হচ্ছে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাবলী। ডাক্তারী পরীক্ষাকালে ডাক্তার দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে রোগিনী। ইদানীং আবার গণধর্ষণ বা পালাক্রমে একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গণ ধর্ষণ-ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। মাস্তান, কালোটাকা, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে শক্তিশালীরা শক্তিহীনদের উপর এ ধরনের শক্তি প্রদর্শনে তৎপর। বোবা, অন্ধ, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীকেও ধর্ষণ থেকে রেহাই দেয়া হচ্ছে না। অপরাধী ধর্ষণ শেষে কখনও সাময়িকভাবে গা-ঢাকা দিচ্ছে, কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা কদাচিৎ ধরা পড়লেও জামিনে ছাড়া পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিগুণ আক্রোশে পুণরায় এ ধরনের অপরাধ করছে কিংবা ধর্ষিতা ও তার পরিবারকে অস্ত্র হাতে হুমকি দিচ্ছে। প্রশাসনের অদক্ষতা, আইনের অপ্রতুলতা, বিচারব্যবস্থার নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য আর দীর্ঘসূত্রিতায় দেখে শুনে মনে হয় যেন দেশে কোন আইন নেই। এমতাবস্থায় সমাজে কোনও নারী ও মেয়ে শিশুই আজ আর নিরাপদ নয়। নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্বে একটি চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সমাজের স্বার্থে, আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই এ অবস্থা থেকে আশু উত্তরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, যে-কোন সামাজিক সমস্যার চটজলদি সমাধান খোঁজা, সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর মাত্র। সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ, গতিপ্রকৃতি, মাত্রা, কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণের পর যথাযথ ব্যবস্থা নিলে সমস্যাটি সংকটে পরিণত হতে পারে না। নারী-শিশু ধর্ষণ, হত্যার মতো সর্বগ্রাসী সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান শেষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দোষীকে শাস্তি প্রদান না করলে সমস্যাটি সমাজে ক্রমশঃ প্রোথিত হয়ে পড়বে। অন্ততঃ অপরাধ প্রবণতার ইতিহাস তাই-ই বলে। উপরন্তু বিষয়টির গভীরে না গিয়ে আপাত সমাধান খুঁজতে গেলে অনেক নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি বিধান হতে পারে আর দোষী ব্যক্তি খালাস পেয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রাচীনকাল থেকে পুরুষ কর্তৃক নারী, নারী কর্তৃক নারী, পুরুষ ও নারী কর্তৃক শিশু নির্যাতন ও সহিংসতা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, খুন, পাচার, দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল সংস্কৃতিতে বিদ্যমান আছে। সময়ের বিবর্তনে তার প্রকৃতি ও মাত্রার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। বর্তমানে মানুষ অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়েছে। পূর্বে নারী-ধর্ষণের মতো ঘটনাকে সযত্নে গোপনীয় রাখা হতো সামাজিক নিন্দাবাদ ও বিধিবিধানের কারণে। বিবাহ-অন্তর্গত ধর্ষণ কিংবা নির্যাতনকে নারীর জন্য সহজাত একটি পাওনা বলে মনে করা হতো। বর্তমানে কিছুটা হলেও মানুষের সচেতনতা পরিবর্তনের সাথে-সাথে পত্র-পত্রিকায় এ সকল সংবাদ পরিবেশন ও প্রকাশ সহজতর হয়েছে। পুলিশ বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যক নারী-শিশু নির্যাতনের কেস গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে সামাজিক চাপের কারণে। তাই প্রতিদিনের

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের মাধ্যমে নারী-শিশু নির্যাতনের খবর ও দুর্ঘটনার সংবাদ আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। এ সমস্যাটির ব্যাপকতা এত অধিক যে, এর ব্যাপ্তিও বৈশ্বিক। ১৯৯৫ সনে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-নারীসম্মেলনে উপস্থিত ১৯০টি দেশের প্রায় ৪০,০০০ সরকারি/বেসরকারি প্রতিনিধিরা এই সমস্যাটিকে একবাক্যে সর্বজনীন সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছেন ও বক্তব্য রেখেছেন।[৩৬] বিশ্বের প্রতিটি দেশে নারীনির্যাতনের সমস্যা উত্তরোত্তর আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি সর্বসম্মত Platform For Action-এ চিহ্নিত ১২টি critical area-বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, নৈতিক সমস্যা তো বটেই।

ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, জোরপূর্বক নারী ও শিশুর সাথে লৈঙ্গিক ও যৌন সম্পর্ক, সহবাস বা তার চেষ্টাকে ধর্ষণ বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যান্য ধরনের যৌনহয়রানিকেও ধর্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ধর্ষণকে আমাদের মতো রক্ষণশীল সমাজে গোপন করা হয়ে থাকে সামাজিক নিন্দাবাদের কারণে, সামাজিক শাস্তির ভয়ে। ধর্ষণ বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও স্পর্শকাতর বলে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনে আমরা যতটা না সোচ্চার তার চেয়েও প্রতিবিধানের জন্য আমরা নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকেই আমরা দোষারোপ করে থাকি। একাধিক ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষণ বাংলাদেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একাধিক সন্ত্রাসী যখন একটি সন্ত্রাস কাজে লিপ্ত থাকে তখন এ ধরনের বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন সন্ত্রাসীরা gang rape- এর ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কখনও গৃহাভ্যন্তরে, কখনও বাইরে, নারী-শিশুদের পর্যায়ক্রমে গণধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে। কখনও একান্তে, কখনও ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনে, কখনও পাটক্ষেতে/ ধানক্ষেতে এমনকি কবরস্থানও এ পাপকাজ থেকে রেহাই পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতাশ

৩৬. Speech by Ralph C Carriere, *Violence Against Women: Analysis and action*, UNICEF Representative in Dhaka at the National Workshop on Eliminating Violenc Against Women, CIRDAP, Dhaka, Sept, 1996, P. 10.

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিক, পারিবারিক বিবাদ, রাজনৈতিক বিসম্বাদ, সম্পত্তি শত্রুতাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের যৌন লালসা নিবৃত্ত করা হয়ে থাকে। গণধর্ষণশেষে নারী-শিশুকে অচেতন, রক্তাক্ত রেখে অপরাধীরা গা ঢাকা দেয়, কখনও নির্যাতিতাকে খুন করে ফেলে। ঢাকার অভিজাত পাড়ায় শাজনীন[৩৭], ইয়াসমিন[৩৮] হত্যা, ধর্ষণ ও খুনের এমনি এক মর্মান্তিক ঘটনা।

শিশু ধর্ষণ এক ধরনের যৌনবিকৃতি। পুরুষের অসীমাবদ্ধ যৌনলালসা নিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। নিষ্পাপ শিশুর অসহায়ত্ব, অবুঝতাকে পুঁজি করে ঘরে বাইরে পুরুষ তার যৌনলালসা, মনোবৈকল্যের নিবৃত্তি ঘটায়- ৬ মাসের কন্যাসম শিশুটিকেও রেহাই দেয় না। তখন অপরাধী অবশ্যই বিস্মৃত হয় যে, সেও একজন পিতা, তারও নিষ্পাপ কন্যা-শিশুটি এ ধরনের ধর্ষণের শিকার হতে পারে। জোরপুর্বক ধর্ষণে ধর্ষিত শিশুটির যৌনাঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায় ও উক্ত দুর্বিপাকে শিশুটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সহজ-সুন্দর পারিবারিক/সমাজ জীবনের দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে চিরদিনের জন্য।

৩৭. শাজনীন ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ধানমন্ডিস্থ নিজ গৃহে ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (সূত্রঃ ০৪-০৬-২০০৩, দি ডেইলী ষ্টার)।

৩৮. ইয়াসমিন ১৯৯৫ সালের ২৪শে আগষ্ট আইনরক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (সূত্রঃ ২৫-০৮-১৯৯৫, দৈনিক জনকণ্ঠ)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৪ হত্যা ও আত্মহত্যা

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষণের পর victim কে হত্যা করা হয়, যেন সাক্ষ্য না দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হত্যার পরও ধর্ষণ করা হয়। এ এক ধরণের যৌনবিকৃত পুরুষের যৌনলালসার বহিঃপ্রকাশ।

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুগে যুগে নারীহত্যা ছিল। বাংলাদেশের সেই যে ১৯৭২ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিন্দ্যসুন্দরী নীহার বানু[৩৯], পরবর্তীতে জয়ন্তী রেজা[৪০], ক্যামেলিয়া[৪১], মাম্মী[৪২] সহ অসংখ্য হত্যা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও একমাত্র জয়ন্তী রেজা ও মাম্মী হত্যার (তাঁদের প্রতিপত্তিশালী অবস্থানের জন্য) অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। নারীকে পিটিয়ে হত্যা, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, মুখের মধ্যে বিষ ঢেলে দিয়ে হত্যা, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ/গোপনাঙ্গ কর্তন করে হত্যা করাসহ বহু প্রকারে নারীহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ স্বামী যৌতুকের কারণে, বহু-বিবাহের কারণে স্ত্রীকে হত্যা করে থাকে। প্রেমিক, হতাশ প্রেমিক বিবাহে অথবা কুপ্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হলে এসিড নিক্ষেপ করে হত্যা করে প্রেমিকাকে।

বাংলাদেশে নারীহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ যৌতুক। প্রায় ৭৫% নারীহত্যা যৌতুকের কারণে হয়ে থাকে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের কারণে মাতৃমৃত্যুর আধিক্য দেখা যায়। অসম-বিবাহ, জোরপূর্বক মাতৃত্বগ্রহণে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণেও বহু হত্যা, আত্মহত্যা হয়ে থাকে। বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন, কালোটাকা, মাস্তানপ্রভাব, কালোবাজারি অধ্যুষিত সমাজে কন্যার পিতা মাতাকে বহু শারীরিক/মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

---

৩৯. নীহার বানু ১৯৭২ সনে রাজশাহীতে স্বামী কর্তৃক নিহত হন।

৪০. জয়ন্তী রেজা ০৯ই জানুয়ারী ২০০৪, স্বামী আজম রেজার বাড়ীতে খুন হন। (সূত্রঃ ১০-০১-২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ)।

৪১. ক্যামেলিয়া ৫ই জুলাই ২০০৫ সনে মিরপুরের বাসায় স্বামী কর্তৃক নিহত হন। (সূত্রঃ ০৬-০৬-২০০৫, দৈনিক প্রথম আলো)।

৪২. মাম্মী ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৯ ইং তারিখে স্বামীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। (সূত্রঃ ২৬-০১-২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বহু নারী তালাকের কারণে আত্মাহুতি দিচ্ছে। পুরুষের জন্য তালাক নিঃশর্ত। বহুবিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে বিনা কারণে, বিনা দোষে, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে যখন-তখন তালাক দিচ্ছে। শিশুসহ অসহায় স্ত্রী অনেকক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিয়ে থাকেন। তালাক তাই বহু কারণে নারীহত্যা ও মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

- "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই"- বেঁচে থাকার জন্য এ আর্তি, এ তীব্র আকাংঙ্খার পরও মানুষ কেন বেছে নেয় আত্মহননের পথ? কেন আত্মহত্যা করে? এ এক বিরাট প্রশ্ন। একই সাথে প্রশ্ন জাগে আত্মহত্যায় কি সত্যিই নিজ জীবনাবসানের প্রতিজ্ঞা কাজ করে নাকি তা নিতান্তই আত্মাভিমানের চরম ধ্বংসাত্মক রূপ? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে যারা আত্মহত্যা করেছেন বা আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে গেছেন তাদের জীবন পরিস্থিতি এবং ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিষয়টির উপর ব্যাপক গবেষণার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এ বিষয়ে গবেষণা খুবই কম হয়েছে- বিশেষ করে আমাদের দেশে। অথচ পত্র-পত্রিকা পড়লে ধারণা হয় আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশেষ করে মেয়েরা আত্মহত্যা করছে বেশি।

আত্মহত্যা বলতে আমরা সাধারণতঃ নিজের জীবন বিসর্জন এবং বিসর্জনের প্রচেষ্টা উভয়কে বুঝাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে এ দুটি এক ও অভিন্ন করে দেখা যুক্তযুক্ত নয়। Kreitman (১৯৬৯) আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে 'প্যারা সুইসাইড' নামে আখ্যায়িত করে বলেন 'আত্মহত্যার প্রচেষ্টা' কথাটি সন্তোষজনক নয়, কারণ যারা আত্মহত্যা করতে গেছে তারা অনেকে সত্যিকার অর্থে নিজের জীবন নাশের জন্য তা করেনি। Stengel (১৯৭২) এর মতে এ ধরনের প্রচেষ্টায় মৃত্যু অপেক্ষা অন্যের সাহচর্যলাভ এবং জীবনের প্রতি মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়। অন্যদের অনুভূতি পরীক্ষা করে দেখা অপরাধবোধ এবং দ্বন্দ্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আকাঙ্খা এখানে অপেক্ষাকৃত প্রবল। এক কথায় প্যারা সুইসাইডে নিজ জীবননাশের চেয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটাই (যেমন, বিষ খাওয়া) প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে বলতে গেলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষ সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে। যেমন

ক) পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার নিদারুণ চাপ;

খ) মানসিক অসুস্থতা যেমন, সিজোফ্রেনিয়া, বিষন্নতা বা গুরুতর শারীরিক অসুখ;

গ) মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, পেথেডিন আসক্তি যা মানুষকে তার পরিবেশ সম্পর্কে অসহনীয় করে তোলে;

ঘ) মনের নাজুক অবস্থা যা তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে মানিয়ে নেওয়া বা Coping এর ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় এবং নিজের দায়দায়িত্বের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে।

Mintz (১৯৬৮) আত্মহত্যার প্রেষণাগুলোর একটি তালিকা দিয়েছেন। এগুলো হল- নিজের দিকে আগ্রাসনকে ধাবিত করা, অন্যদের ভালবাসা জোর করে পেতে চাওয়া, অতীতের 'প্রত্যক্ষিত' ভুলের জন্য অনুশোচনা এবং তা থেকে পরিত্রাণের আকাংক্ষা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা পীড়ন থেকে অব্যাহতিলাভের ইচ্ছা, বেদনাবোধ, অন্যের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলা এবং আবেগীয় শূন্যতাবোধ।

আত্মহত্যার ক্লাসিক তত্ত্ব প্রধানতঃ দুটি। একটি ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব, অপরটি এমিল ডুর্খাইমের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ।

ফ্রয়েড আত্মহত্যার ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি প্রধান প্রকল্প উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ আত্মহত্যাকে তিনি এক প্রকার হত্যা বা আগ্রাসী আচরণ হিসেবে দেখেন। কোন ব্যক্তি যখন এমন একজনকে হারায় যাকে সে একাধারে অত্যন্ত ভালবাসে এবং ঘৃণা করে তখন সে আগ্রাসনকে নিজের দিকে ধাবিত করে আত্মহত্যা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মানুষের মধ্যে জীবনপ্রবৃত্তির (Uros) পাশাপাশি মৃত্যু বা ধ্বংস প্রবৃত্তিও (Thanatos) রয়েছে। এই ধ্বংস প্রবৃত্তির প্রভাবেই মানুষ নিজের জীবন নাশ করে।

ফ্রয়েডের এ মতবাদের স্বপক্ষে গবেষণালব্ধ তথ্যের অভাব থাকায় অনেকেই এ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি। আত্মহত্যার প্রাক্কালে লেখা চিরকুট পর্যালোচনা করে গবেষকই (Tuckman Kleiner এবং Lavell, ১৯৫৯) মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সাথে দ্বিমত পোষণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই আত্মহত্যাকারীদের চিরকুটে বিদ্বেষের প্রকাশ দেখা যায়। তবে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, চিরকুট চেতন মনের বহিঃপ্রকাশ, সুতরাং মনোসামাজিক কারণে অবচেতন মনের বিদ্বেষ সেখানে অর্থাৎ চিরকুটে প্রকাশিত না-ও হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম (১৮৯৭) আত্মহত্যার কারণ হিসাবে সামাজিক উপাদানের প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে যে কোন স্থিতিশীল সমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা কম। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন- (১) Egoistic Suicide বা আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার, (২) Altruistic Suicide বা পরার্থপরতাযুক্ত আত্মহত্যা এবং (৩) Anomic Suicide বা বিচ্ছিন্নতা বোধগত আত্মহত্যা। প্রথমটিতে ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে ভারাক্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন বোধ করে এবং পরিণতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ পরার্থপরতাযুক্ত আত্মহত্যায় ব্যক্তি তার সমাজ বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মাহুতি দেয়। তৃতীয় বা বিচ্ছিন্নতা-বোধগত আত্মহত্যায় ব্যক্তি সামাজিক পারিবর্তনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে বলে বেদনা অনুভব করে এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

দুর্খাইমের তত্ত্বের সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে এ তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা এই যে একই সামাজিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কেন বিভিন্ন রকমের হয় সে সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ একই সামাজিক পরিস্থিতিমূলক চাপে কেন একজন আত্মহত্যা করে- অন্যেরা করে না তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এ তত্ত্বে পাওয়া যায় না। দুর্খাইম যে এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন না তা নয়। তিনি ব্যক্তির মেজাজ (Temperament) এর সাথে সামাজিক চাপের আন্তঃক্রিয়ার কথা বলেন, তবে সে ব্যাখ্যা ততখানি সুস্পষ্ট হয়নি।[৪৩]

৪৩. হামিদা আখতার খানম, *বাংলাদেশে মেয়েদের আত্মহত্যা*, উইমেন ফর উইমেন, ২০০৫, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মনোবিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণায় বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মহত্যা প্রবণতার সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নৈরাজ্যে নিজ সমস্যার প্রতি rigid বা অনড় মনোভাব এবং নিজ সমস্যা সমাধানে বিকল্প পন্থা সম্পর্কে চিন্তাধারার অভাব ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে।

আত্মহত্যার অন্যতম কারণ মানসিক রোগগ্রস্ত অবস্থা। বিষন্নতা (Depression), ব্যক্তিত্ব বৈকল্য (personality disorder), মাদকাসক্তি প্রভৃতি মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা সাধারণ লোকের চেয়ে বেশি। একটি গবেষণায় (Baraclough, ১৯৭২) ১০০ জন আত্মহত্যাকারীর জীবন ইতিহাস পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের ডাক্তার ও প্রিয়জনদের সাথে আলোচনার মাধ্যেমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৩ জনের মধ্যে মানসিক রোগের উপসর্গ উপস্থিত ছিল। গবেষকদের মতে বিষন্নতার কেস ছিল শতকরা ৬০ ভাগ। এ ছাড়া আত্মহত্যা করার আগে তারা ডাক্তার এবং প্রিয়জনদের কাছে আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলেও ধারণা করা হয়। Sainsbury (১৯৭৮)র মতে বিষন্নতা রোগগ্রস্তদের মধ্যে যাদের বয়স ৪০ বছরের বেশি, সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, পরিবার আত্মহত্যার ইতিহাস রয়েছে, অপরাধবোধ বা অনুপযুক্ততা-বোধ রয়েছে, যারা অনিদ্রায় ভোগে, মাদকাসক্ত অথবা যারা বিষন্নতা রোগে প্রারম্ভিক পর্যায় অথবা রোগমুক্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি বেশি থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ২৫০০০ মৃত্যু শুধু মাত্র বিষন্নতা রোগের কারণে হয়ে থাকে বলে জানা যায়। পুরুষদের প্রায় তিনগুণ বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলাদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। তবে প্রকৃত আত্মহত্যা বা জীবননাশের ঘটনা মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে অনেক বেশি প্রায় তিনগুণ এর আংশিক কারণ হলো পুরুষরা অনেক বেশি নিশ্চিন্ত পদ্ধতি যেমন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে যেখানে মহিলারা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত পদ্ধতি যেমন মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রয়াস পায় (Goodstein Calhoun ১৯৮২)। বিষন্নতা রোগীদের তুলনায় কম হলেও মাদকাসক্ত বিশেষ করে মদ্যপায়ীদের (alcoholic) মধ্যে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা বেশি দেখা যায় (Kessel et.al. ১৯৬৩)। এদের অধিকাংশের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় যে তারা শৈশবে পিতামাতার স্নেহ এবং সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার মৃত্যু আবার কখনও বা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ এই বঞ্চনার উৎস।[৪৪]

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা চলে যে, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা মূলতঃ মানসিক কারণে ঘটলেও তার পিছনে রয়েছে জীবন-পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা যা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও কৃষ্টিগত ক্ষেত্র থেকে উদ্ভুত। অর্থাৎ আত্মহত্যা একটি মনোসামাজিক বিষয়। যেহেতু সমাজব্যবস্থার সাথে মানসিক অবস্থা (সুস্থতা বা অসুস্থতা) ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে কারণে দেশভেদে, কৃষ্টিভেদে, আত্মহত্যার তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে হাঙ্গেরী, এরপর রয়েছে ফিনল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া। গ্রীস, ইটালী, ইসরাইল, নেদারল্যান্ড ও নরওয়েতে আত্মহত্যার ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম। কোন কোন বছর ডেনমার্ক এবং জাপান এ বিষয়ে এগিয়ে যায়। তবে জাপানের আত্মহত্যায় কৃষ্টিগত দিকের প্রাধান্য রয়েছে। কোন কোন কৃষ্টিতে পরাজয়কে এতই গ্লানিকর মনে হয় যে সেখানে অনেকে পরাজয়ের কাছে আত্মসমর্পনের চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় মনে করে। অন্যান্য সামাজিক কারণের মধ্যে একাকীত্ব, (Kessel ও অন্যান্য ১৯৬৩), বেকারত্ব, দারিদ্র্য (Sainsbury, ১৯৫৫) এবং সামাজিক শ্রেণীগত বৈষম্য উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে মেয়েদের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে যে কারণটি সর্বপ্রধান বলে প্রতীয়মান হয় তা হল সমাজ কাঠমোতে নারী-পুরুষ বৈষম্যহেতু নারীর অধস্তন অবস্থান। সংবাদপত্রে মেয়েদের আত্মহত্যার যে সব খবর ছাপানো হয় তাতে প্রায়ই দেখা যায় স্বামীর/শ্বশুর-বাড়ির অত্যাচার, গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে বৌ গলায় দড়ি দিয়ে অথবা কীটনাশক ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

৪৪. হামিদা আখতার খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

এই অত্যাচার এবং গঞ্জনার পিছনে প্রায়ই থাকে দুর্ভাগা সেই সব বধূর বাবা-মাদের যৌতুক দেবার অক্ষমতা। এ ছাড়া রয়েছে স্বামী কর্তৃক অকারণ তালাক, অথবা দ্বিতীয় বিয়ে, অথবা সন্তানসহ অজানা কারণে পরিত্যাক্ত হওয়ার করুণ কাহিনী। সামাজপতিদের নির্যাতনের অসহনীয় যন্ত্রণায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অতীতে এমনি এক মর্মান্তিক মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত নূরজাহান[৪৫] যা বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষ এখনও বিস্মৃত হয় নি।

মানসিক রোগগ্রস্ততার কারণে আত্মহত্যার ঘটনাগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনঃস্তাত্তিক কারণ হিসেবে মনে হলেও সুগভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সেই অসুস্থতার পিছনে রয়েছে লিঙ্গগত বৈষম্যের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক কারণ[৪৬]।

বাংলাদেশে মেয়েদের আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্যের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণায় তথ্যের উৎস হিসেবে একটি দৈনিক সংবাদপত্র নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত দৈনিক সংবাদপত্রটি ছিল "আজকের কাগজ"। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়কালে এ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মেয়েদের আত্মহত্যার খবরের ভিত্তিতে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, বসবাসের এলাকা, আত্মহত্যার ধরন এবং কারণ সমীক্ষা করাই ছিল এ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়। সারণী ৫ এ সংগৃহীত উপাত্ত উপস্থাপন করা হল[৪৭]।

৪৫. সমাজপতিদের সালিশিতে নূরজাহানকে আবক্ষ মাটিতে প্রোথিত করে ১০১টি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রকাশ্য অন্যায় নির্যাতনের অপমান সইতে না পেরে ১৯৯৩ এর ১০ই জানুয়ারী নূরজাহান বিষপানে আত্মহত্যা করে।

৪৬. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, *ফতোয়ার বলি ছাতকছড়ির নূরজাহান*, ঢাকা ঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহয়তা উপ-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৭, পৃ.২৩।

৪৭. হামিদা আখতার খানম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫ ঃ বয়স অনুসারে মহিলাদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও শতকরা হার

বয়স	সংখ্যা	%
১২-১৬	৩০	১৯.৮৬
১৭-২১	৪১	২৭.১৫
২২-২৬	৪৮	৩১.৭৯
২৭-৩১	১৬	১০.৫৮
৩২-৩৬	০৭	৪.৬৩
৩৭-৪১	০৪	২.৬৪
৪২-৪৬	০১	০.৬৬
৪৭-৫১	০২	১.৩২
৫২-৫৬	০১	০.৬৬
৫৭-৬১	০০	০.০০
৬২-৬৬	০১	০.৬৬
মোট	১৫১	৯৯.৯৫

সারণী ৫ থেকে দেখা যায় যে ২২-২৬ বছর বয়সে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি (৩১.৭৯%) হলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যার সিংহভাগ (৭৮.৮০%) ঘটেছে ১২ থেকে ২৬ বছর বয়সীদের মধ্যে। অর্থাৎ কিশোরী এবং তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা বেশি ঘটেছে যা পাশ্চাত্য দেশেও দেখা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৫ ভুল ফতোয়া

এদেশের ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নামে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করেছেন। যেমনঃ ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণা, কন্যাদান ও দেবদাসী ইত্যাদির মাধ্যমে পাপ মোচনের নামে অর্থ কামিয়েছেন এবং নিজেদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে ব্রাহ্মণদের অনুকরণে কতিপয় অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞানধারী ব্যক্তিরা মূর্খতা জনিত ভুল ফতোয়া দিয়ে আসছেন। যা ইসলামের প্রকৃত বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামী মতে ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞাসাকে ফতোয়া বলে। সমাজের সাধারণ মুসলমানেরা যে সব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত নন, তারা এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আলেম ওলামা এবং জ্ঞানী ইমামদের দ্বীনি কর্তব্য তাদেরকে শরীয়তের ফয়সালা জানানো।

মুসলিম শাসনামলে সরকারের পক্ষ থেকে যোগ্য আলেমকে (বাংলা অর্থ বিশেষজ্ঞ) ফতোয়া প্রদানের জন্য নিয়োগ করতেন। কিন্তু বৃটিশ প্রভাবের পর থেকে আমাদের মহাদেশে এর প্রচলন না থাকার কারণে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুফতি হিসেবে নিয়োগ করে থাকে।

মূলতঃ ফতোয়া হলো শরীয়তের সঠিক হুকুম জানিয়ে দেয়া। তবে সে হুকুম বাস্তবায়িত করা সরকারের দায়িত্ব। যেমনঃ মৃত্যুদন্ড প্রদান বা বিশেষ অপরাধের জন্য নিধারিত দন্ড দেয়া হয়। শরীয়তের পরিভাষায় 'হদ' বলে। এটি কার্যকরী করা একমাত্র সরকারের উপর ন্যস্ত, মুফতি বা কোন ইমাম তা কার্যকর করতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কিছু অর্ধশিক্ষিত আলেমদেরকে ব্যবহার করে ফতোয়া দিয়ে শাস্তি কার্যকর করছে যা ইসলামী আইন সমর্থন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে প্রতিদিন নারী ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, নির্যাতনের মতো জঘন্য ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এ নিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর তেমন একটা মাথা ব্যথা নেই। প্রভাবশালীদের সহায়তায় অপরিপক্ক আনাড়ী আলেমদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে ফতোয়াবাজীর ঘটনাকে পুঁজি করে প্রচার মিডিয়ায় মানুষের দ্বীনি আকিদা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করছে এই বিশেষ শব্দ 'ফতোয়াবাজ'কে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শাস্তি নয়, প্রতিরোধে উৎসাহী । নারী-শিশু নির্যাতনের উৎস বা প্রক্রিয়াগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে অপরাধীদের শাস্তি দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অমানবিক।

উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত তফসিরকারক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান সম্পর্কে লিখেছেন[৪৮]ঃ

'ইসলামী দন্ডবিধির ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, হাত কাটার শাস্তি এবং শরীয়ত প্রবর্তিত অন্যান্য দন্ডবিধি শুধুমাত্র সেই জায়গায় কার্যকর করার জন্য রচিত হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবন সংগঠিত ও বিন্যস্ত থাকে। ইসলামের নীতিমালা ও আইন-কানুন বিভাজ্য বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছু নীতিমালা ও আইন-কানুন কার্যকর করা হবে আর কিছু বাদ থাকবে এটা ঠিক নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটনা সংক্রান্ত দন্ডবিধির কথাই ধরা যাক। বিয়ে, তালাক ও পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী আইনবিধি এবং নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে এই দন্ডবিধির অত্যন্ত গভীর ও

৪৮. উদ্ধৃতি ঃ সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, ঢাকা ঃ মতিঝিল, ২০০১, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারকারী ও ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর জন্য এমন কঠোর সাজা নির্ধারণ করেছেন একটা বিশেষ সমাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে যে সমাজে মহিলারা সেজেগুজে অবাধে ও খোলাখুলিভাবে বিচরণ করে না, নগ্ন, অর্ধ নগ্ন ছবি, প্রেম-ভালোবাসা সম্বলিত কিচ্ছা-কাহিনী, যৌন আবেগে ক্রমাগত সুড়সুড়ি দেয়া অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির প্রচলন থাকে না, যে সমাজে বিয়ে করা সহজসাধ্য এবং বিয়ে বিচ্ছেদের ইসলামী বিধিসমূহ সফলভাবে প্রয়োগ করা হয় কেবলমাত্র সেই সমাজেই এই দন্ডবিধি প্রযোজ্য। এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবেই এ দাবী জানাতে থাকে যে, সামাজিক আচরণের জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা লংঘন করছে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর দন্ড প্রবর্তন করা হোক। বস্তুত যেখানে বৈধ উপায়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামাজিক পরিবেশকে ব্যাভিচারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণাদি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে এ ধরনের কঠোর সাজা প্রবর্তন মোটেই অন্যায় নয়। এ ধরনের নির্মল পরিবেশেও যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়া কেবলমাত্র জঘণ্যতম অসচ্চরিত্রের লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অনাচার থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু যে সমাজে এ ধরনের পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে না, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা রীতিসম্মত, যেখানে বিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ক্লাবে ও প্রমোদ কেন্দ্রে, গোপন ও প্রকাশ্য অঙ্গনে সর্বত্র এসব উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের পুরুষ ও বিচিত্র সাজে সজ্জিত নারীদের লাগামহীন মেলামেশা ও একত্রে ওঠা-বসার সুযোগ রয়েছে, যেখানে চারদিকে অগণিত কামোদ্দীপক উপকরণ ছড়ানো রয়েছে এবং বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে কামবাসনা চরিতার্থ করার সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানে মানুষের নৈতিক মানের এতই অধঃপতন ঘটেছে যে, অবৈধ সম্পর্ক মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না । এ ধরনের সমাজে ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটানোর শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুমের শামিল হবে। কেননা এ ধরনের পরিবেশে একজন সাধারণ মানের মধ্যম স্বভাবের ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষের পক্ষেও ব্যাভিচার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

Dhaka University Institutional Repository

যে, ঐ লোকটা অস্বাভাবিক ধরনের নৈতিক অপরাধী। প্রকৃতপক্ষে পাথর মেরে হত্যা ও বেত মারা শাস্তি এমন নোংরা ও ঘৃণ্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেননি।'

সংবাদপত্রের বিবরণে ফতোয়া-

- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করায় আবিরন নেছার জানাজা পড়া যাবেনা[৪৯]।
- ফতোয়া বাজির কারণে ১৫ বছরে ২৬ নারীর আত্মহত্যা[৫০]।
- নওগাঁয় শ্লীলতা হারিয়ে বিচার চাওয়ায় গৃহবধুকে ১০১ দোররা[৫১]।

৪৯. সূত্র ঃ প্রথম আলো, ৫.০২.২০০৬।
৫০. সূত্রঃ প্রথম আলো, ৩১.০২.২০০৬।
৫১. সূত্রঃ প্রথম আলো, ০৩.০৪.২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৬ যৌতুক

বাঙালি সমাজে ও পরিবারে বধূ- নির্যাতনের ঘটনা অতিপুরনো হলেও চিরনতুনরূপে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিবাহপ্রথা ও পরিবারপ্রথার নানা বিবর্তনের ইতিহাস সমাজ-ইতিহাস এবং সাহিত্য পর্যালোচনা করলে জানা যাবে বধূ-নির্যাতনের বিচিত্র, ক্রূর, বেদনাদায়ক কাহিনী। নারীর অসহায়ত্ব, পরনির্ভরতা, ধর্মীয় সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়িতে বন্দি জীবনযাপন এবং পরিণতিতে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, স্বামীর বহুবিবাহের নিগ্রহ, বৈধব্য ইত্যাদি দুর্ভাগ্যের ব্যাপক বিবরণ ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা উপকরণে লিপিবদ্ধ আছে।

বরপক্ষের পণ বা যৌতুকের দাবি বধূ-নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বাঙালি সমাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং পরিণামে অনেক ক্ষেত্রে বধূ-হত্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এদেশে যৌতুকের উদ্ভব কবে কখন হয়েছিল সেই অনুসন্ধান আলো ফেলেছে কৌলীন্যপ্রথা ও তার কুফলের ওপর। দ্বাদশ শতকে সূচিত যে কৌলীন্যপ্রথা বিয়েকে পুরুষের জীবিকা করে তুলেছিল তার নিপীড়নের ফাঁস নারীর গলায় চেপে বসে অচিরে। উনিশ শতকের নতুন কৌলীন্য সমাজ ও পরিবারে আবেষ্টনীতে নারীর ওপর নতুন পীড়ন শুরু করে। বিশ শতকে এর মাত্রা বেড়েছে বই কমেনি।

বাঙালি হিন্দু-ব্রাহ্ম-মুসলিম-বৌদ্ধ ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্চার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। বাঙালি সমাজে যৌতুক প্রথার সূত্র অনুসন্ধান করাই আমাদের লক্ষ্য। হিন্দুসমাজের যৌতুক একসময়ে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক বা উপহারস্বরূপ বিবেচিত হতো[৫২]।

---

৫২. মালেকা বেগম, *যৌতুকের সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০০৬, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমসমাজে বিশ শতকের আগে যৌতুক বা বরপণের অস্তিত্ব ছিল না। কালক্রমে হিন্দু ও মুসলিম দুই সমাজের বরপণের সমার্থক শব্দরূপে যৌতুক ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

যৌতুকের বিষাক্ত ছোবল বধূকে ভাবিত ও প্রাণশূন্য করার পাশাপাশি তার পরিবারের সকলের ওপর আঘাত হানে। সমাজে আলোড়ন জেগেছে এই নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে। আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের ছবি এবং বিবরণ পাওয়া যায় সমাজের দর্পণ সাহিত্যে, পত্রপত্রিকায় এবং নির্যাতিত নারীর জীবন-আলেখ্যে। সাহিত্য ও সমাজে যৌতুকের প্রতিফলন পর্যালোচনা করলে যৌতুক-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সমাজে কণ্ঠস্বর, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদের কথাও জানা যায়।

যৌতুক প্রথা সরাসরি যুক্ত বিয়ে-ব্যবস্থার সঙ্গে। যৌতুক প্রথার উদ্ভব জানার জন্য বাঙালির বিয়ে-ব্যবস্থার বিষয়ে জানা দরকার। প্রাসঙ্গিক লিপিবদ্ধ উপকরণের অভাবে বাঙালি জীবনে বিয়ের প্রারম্ভিক ইতিহাস এখনো অজানা রয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ, জীবনচর্চা, আচার-নীতির লিখিত তথ্য নেই। পরবর্তী সময়ে নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান ও গবেষণায় আদিমানুষ সম্পর্কে জানা যায় যে তারা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ এবং যাযাবর। এই যুগের তথ্যেও বিয়ের খবর নেই। কৃষিসভ্যতার সূচনাকালে একজন সঙ্গী নারীকে ঘরে ঢুকিয়ে পুরুষ সঙ্গী নিজের বংশানুক্রম নিশ্চিত করতে পরিবার গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই যুগেও বিয়ের বিধি চালু ছিল না। তবে নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় সেযুগে তথাকথিত আদিমতম পরিবারের স্ত্রী নারীর একজন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। স্বামী পুরুষের বহুনারী- সঙ্গ সমাজে অনুমোদিত হয়েছিল। নারীকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা এবং নারীর ওপর আধিপত্যের প্রতাপ খাটাবার শুরু সেযুগ থেকেই[৫৩]।

৫৩. আওগুষ্ট বেবেল, (অনুবাদঃ কনক মুখার্জী), *নারী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, কলকাতা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৩, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বরপক্ষ-কনেপক্ষের মধ্যে অর্থ-সামগ্রী আদান-প্রদানের প্রথাই পণপ্রথা। বরপক্ষ যখন কনেপক্ষকে এই পণ দেয় তখন সেটাকে বলা হয় কনেপণ। অন্যদিকে বরপণপ্রথায় কন্যাপক্ষ থেকে সামগ্রী-অর্থ দিতে হয় বরপক্ষকে। সেটাকে বলা হয় যৌতুক। এভাবে স্থাপিত প্রত্যেক বিয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কনে বরের পরিবারের মধ্যে বা জ্ঞাতিকুলের মধ্যে। অতীতে ইউরোপে এরকম যৌতুক বিবাহ ও কন্যাপণ বিবাহ দুই-ই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে তা সমাজ থেকে তিরোহিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের বিয়ের বর্তমান ভিত্তির সঙ্গে বাঙালি সমাজের বর্তমান বিয়ের ভিত্তি তুলনা করলে দেখবো পাশ্চাত্য সমাজের বিয়ে হয় দম্পত্তির মধ্যে অর্থাৎ বর ও কনের মধ্যে। এ ধরনের বিয়েতে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রেমই হচ্ছে নৈতিক বন্ধন বা ভিত্তি। বিয়েতে পরিবারে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, আমন্ত্রিত অতিথি উপহার দেয় দম্পতিকে। কিন্তু বাঙালি সমাজে বিয়ে হয় মূলত পারিবারিকভাবে বাবা-মায়ের পছন্দে। কখনও কখনও পাত্র-পাত্রীর পছন্দে। তবে বাঙালি সংস্কৃতি, সমাজ ও পরিবার কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের জন্য বিয়ে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে না হয়ে হয় দুই পরিবারের মধ্যে। এরকম বিয়ের ক্ষেত্রে কনেপক্ষের ওপর যৌতুক দেওয়ার চাপ পড়ে। এভাবেই বাঙালি সমাজে বাধ্যতামূলক বরপণপ্রথা প্রচলিত হয়েছে।

সামাজিক-পারিবারিক কালব্যাধি ও দুষ্টক্ষত হিসেবে নিন্দিত ও ঘৃণিত হলেও যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের সমাজে শিকড় ছড়িয়ে চলেছে।

সংবাদপত্রের বিবরণে যৌতুকপ্রথার চিত্র

- যৌতুক না পেয়ে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ[৫৪]।
- যৌতুকের লাখ টাকা নেবার পর ফের টাকা দাবী, না পেয়ে বউকে পুড়িয়ে হত্যা[৫৫]।
- যৌতুক কারণে বাবার বাড়িতে সেলিনার মানবেতর জীবনযাপন[৫৬]।

৫৪. সূত্রঃ প্রথম আলো, ২৭-০২-২০০৭।
৫৫. সূত্রঃ জনকণ্ঠ, ০৩-০৪-২০০৭।
৫৬. সূত্রঃ জনকণ্ঠ, ০৭-০৪-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

- যৌতুক না পেয়ে শিশু সন্তানসহ আমেনাকে তাড়িয়ে দিয়েছে পাষন্ড স্বামী[৫৭]।
- মেহেদীর রাতেই যৌতুক পৌঁছাতে না পারায় বিয়ে ভেঙেছে সুমির[৫৮]।

পরিবারের নির্যাতিত নারীর খবর পত্রিকায় প্রকাশের পর সামাজিক লজ্জা ও ধিক্কারের মুখোমুখি হতে হয়। পরিবারের অবিবাহিত অন্যান্য মেয়ের বিয়ের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব কারণে যৌতুক সমস্যার খবর পরিবারের ভিতরেই চেপে রাখা হয়। সহ্য ও সমঝোতা করে চলার জন্য নির্যাতিত মেয়ে ও পুরো পরিবারের ওপর সামাজিক চাপ থাকে। মেয়ে স্বামীর সংসার করতে পারেনি সেটা যেন মেয়ে ও পরিবারের সবার লজ্জা। এই লজ্জা গোপন করাই শ্রেয়-এই প্রবণতা পরিবার-সমাজ-ব্যক্তি মানসে শিকড় গেড়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই প্রবণতার মূল বিষয় হচ্ছে যৌতুক-সমস্যা ব্যক্তিগত বিষয়, সংবাদপত্রে এই খবর ছাপা হওয়া মানেই সকলের চোখে মেয়েটির ও পরিবারটির মান ইজ্জত খোয়ানো।

৫৭. সূত্রঃ জনকণ্ঠ, ১০-০৪-২০০৭।
৫৮. সূত্রঃ প্রথম আলো, ১০-০৫-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২: ২০০৭ সালে নারী-শিশু নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা

- স্কুলছাত্রী অপহরণ[৫৯]।
- অসংখ্য নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে[৬০]।
- ভারতে পাচারকালে ৪ শিশু উদ্ধার[৬১]।
- গৌরনদীতে সেনা কর্মকর্তার মেয়েকে অপহরণ[৬২]।
- ভারতে পাচারের সময় সাতক্ষীরা সীমান্তে ৮ শিশু উদ্ধার[৬৩]।
- সাভারে অপহৃত শিশু উদ্ধার[৬৪]।
- রামুতে এক সংখ্যালঘু মেয়ে শিশুকে অপহরণ[৬৫]।
- মিটফোর্ড হাসপাতালে শিশু চুরি[৬৬]।
- পুরনো ঢাকা থেকে শিশু অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপন দাবী[৬৭]।

৩.৩ নারী-শিশুর সাংবিধানিক অধিকার ঃ

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিধার কথা একান্তভাবে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানে একজন নারীকে একজন পুরুষের ন্যায় দেশের একজন নাগরিক হিসেবে গন্য করা হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশু অধিকার আলোচিত হল[৬৮]।

---

৫৯. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭-০৭-২০০৭।
৬০. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮-০৬-২০০৭।
৬১. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৪-০৪-২০০৩।
৬২. সূত্রঃ দি ডেইলী স্টার, ২২-০৭-২০০৭।
৬৩. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯-০৭-২০০৭।
৬৪. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ০২-০৬-২০০৭।
৬৫. সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১১-০৬-২০০৭।
৬৬. সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৫-০৭-২০০৭।
৬৭. সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ০২-০১-২০০৬।
৬৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকাঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদঃ ৯ঃ রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন। এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদঃ ১০ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৫ঃ (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাব-গ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদঃ ১৮ঃ (২) গনিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদঃ ২৮ঃ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেননা।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ন নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারনে জনসাধারনের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবেনা।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবেনা।

অনুচ্ছেদঃ ২৯ঃ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। যে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের

Dhaka University Institutional Repository

কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবেনা।

(৩) গঃ এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়। সেরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবেনা।

অনুচ্ছেদঃ ৩৪ (১) সকল প্রকার জবর দস্তি শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হলে তাহা আইনত; দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম ভাগ

আইনসভা

অনুচ্ছেদঃ ৬৫ (৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা আইনানুযায়ী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবেনা।

৩.৪ নারী ও শিশুর আইনী অধিকার

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে আইনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ও এসিড নিয়ন্ত্রন আইন, ২০০২ থেকে গবেষণার প্রয়োজনে কিছু আইন তুলে ধরা হল[৬৯]।

৬৯. মোঃ আনছার আলী খান, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ২০০০, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪। দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি -

১. যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

২. যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবনশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবনশক্তি নয় বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন;

খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন সাত বৎসরে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৩. যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি, তার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হলেও, অনধিক সাত বৎসসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৪. এই ধারার অধীন অর্থদন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হতে বা তারা বিদ্যামান সম্পদ, বা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পদ হতে আদায় করে অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি-

১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন[৭০]।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তা হলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করেছেন তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করেছেন বলে গন্য হবেন এবং তিনি উপধারা (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তা হলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করেছেন বা দখলে বা জিম্মায় রেখেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৬. শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি-

১) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হতে আনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখল, জিম্মা বা হেফাজতে রাখেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হতে চুরি করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন[৭১]।

৭। নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৭১. অধ্যাপক ফারুক খান, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২ এবং এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২*, ঢাকাঃ ডাইনামিক পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৮। মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৯। ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি -

১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

১০। যৌন পীড়ন, ইত্যাদির শাস্তি-

১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তা হলে তার এই কাজ হবে যৌন পীড়ন বা তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

২) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর শ্লীলতানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তার এই কাজ হবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন[৭২]।

১১। যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি-

১) যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটনা বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন, তা হলে উক্ত স্বামী, স্বামী পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন;

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

১২। ভিক্ষাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হবেন।

১৩। ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান-

অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করলে-

ক) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করবেন;

খ) উক্ত সন্তান জন্মলাভের পর সন্তানটি কার তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং তার ভরণপোষণ বাবদ ধর্ষণকারী কি পরিমাণ খরচ তত্ত্বাবধানকারীকে প্রদান করবে তা ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করে দিতে পারবে;

গ) উক্ত সন্তান পঙ্গু না হলে, এই খরচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হবে[৭৩]।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ-

১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী ও শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে দুই বৎসর কারাদন্ডে বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন[৭৪]।

১৫। ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হতে অর্থদন্ড আদায়-

এই আইনের ৪ ধারা হতে ১৪ ধারা পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদন্ডকে, প্রয়োজনবোধে, ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করতে পারবে এবং অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হতে বা তার বিদ্যমান সম্পদ হতে আদায় করা সম্ভব না হলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সেই সম্পদ হতে আদায়যোগ্য হবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা উক্ত অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাবে।

১৬। অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি-

এই আইনের অধীনে কোন অর্থদন্ড আরোপ করা হলে, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করবেন এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করবে[৭৫]।

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি-

১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনে অভিপ্রায় উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জেনেও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তা হলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ করেছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত দন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

২) কোন ব্যক্তি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করতে পারবে[৭৬]।

১৮। অপরাধের তদন্ত-

১) এই আইনের অধীনে অপরাধের তদন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক, অপরাধটি সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে, সম্পন্ন করতে হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি, বিশেষ কারণ প্রদর্শন করে, ট্রাইব্যুনালকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তা হলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা অনধিক ত্রিশ দিন বর্ধিত করতে পারবে।

২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়সীমার মাধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা মামলার বিচার চলাকালীন যে কোন সময় ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করা বা, ক্ষেত্রমত, তৎসম্পর্কে অধিকতর তদন্ত বা অধিকতর তদন্ত সমাপ্তির নির্দেশ দিতে পারবে।

৩) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে, ট্রাইব্যুনাল-

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) অন্য কোন কর্মকর্তার দ্বারা অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দিতে পারবে; এবং

(খ) এই ধারার অধীন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করতে ব্যর্থ তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতার বিষয়টি অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করে উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ দিতে পারবে।

৪। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্চনীয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করবার নির্দেশ দিতে পারবে[৭৭]।

৫। যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে ইচ্ছাকৃত গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করা বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করে তদন্ত দাখিল করেছেন, তা হলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা ক্ষেত্রমত অসাদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করে ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে।

৬। ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তাথ্যের ভিত্তিতে কোন তদন্ত কারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবে।

---

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি-

১) এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) হবে।

২) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হবে।

৩) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত বা শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেয়া হবে না, যদি-

(ক) তাকে মুক্তি দেয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেয়া না হয়; এবং

(খ) তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন; অথবা

(গ) তিনি নারী ও শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হন এবং তাকে জামিনে মুক্তি দেয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে না মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট না হন[৭৮]।

২০। মুক্তিপণ দাবী, আদায় ইত্যাদির শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী ও শিশু ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে আটক বা অপহরণ করেন বা উক্ত অন্য ব্যক্তিকে বা তৃতীয় ব্যক্তিকে আটক বা অপহরণের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন, বা উক্তরূপ আটক বা অপহরণের পর কাহারও নিকট হইতে মুক্তিপণ দাবী করেন বা আদায় করেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারদন্ডে বা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন[৭৯]।

২১। এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

---

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৭৯. গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

২২। এসিড দ্বারা আহত করার শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি কোন এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে তাহার-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয় বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন[৮০]।

২৩। এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা করার শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর এসিড নিক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোন ভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, তিনি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন[৮১]।

২৪। অপরাধের সহায়তার শাস্তি-

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের সহায়তা করেন এবং সেই সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দন্ডে সহায়তাকারী ব্যক্তি দন্ডনীয় হইবেন।

৮০. অধ্যাপক ফারুক খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি-

১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার অন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলা বিচার করিতে পারিবে[৮২]।

২৬। ক্ষতিগ্রস্তকে অর্থদন্ডে অর্থ প্রদান-

এই আইনের অধীন অর্থ দন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ জাতিসংঘ ও নারী অধিকার

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে দেখা গিয়েছে নারীরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে-আর তা দূরীকরণের প্রত্যাশায় জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সকল অংশের বিকাশ ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালকে "বিশ্ব নারী বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। নারী বর্ষ শেষে দেখা গেল শতাব্দীর পাশ্চাৎপদতা, অবহেলা, উদাসীনতা ও বৈষম্য দূর করার জন্য আরও কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উলব্ধি থেকে ১৯৭৬-১৯৮৫ এই সময়কাল পর্যন্ত নারী উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নের ব্যাপারে একটি সচেতনতা সৃষ্টি হলেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যসমূহ রয়ে যায়[৮৩]।

৩.৫.১ সিডও ও বাংলাদেশ

১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেটি হলো "নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা কনভেনশন" যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against women বা সংরক্ষণের CEDAW (সিডও)। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার সম প্রতিষ্ঠার জন্য ত্রিশটি ধারা বা বিধান সম্বলিত এই কনভেনশনটিতে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৩. তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*, ঢাকা ঃ বাংলা একডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই CEDAW-কনভেনশন প্রণয়নে রয়েছে তিন দশকের অধিক দীর্ঘ ইতিহাস ও জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সচেতন নারী সমাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী নারীর পশ্চাৎপদতা ও 'বৈষম্য নিরূপণের উদ্দেশ্য ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ Commission on the stares of women (নারী মর্যাদা কমিশন) নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীর তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। পরবর্তীতে নারীর মর্যাদা কমিশনের কার্যক্রমের এবং সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরবর্তীতে 'জাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ' বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব সনদ' 'বিবাহের সম্মতির ন্যূনতম বয়স সনদ' 'দাসত্ব ও পতিতা বৃত্তি সনদ' ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর প্রতি বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের সঠিক রূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন সম্বন্ধে একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে উপরোক্ত সনদগুলোসহ নারীর অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বিবৃত হয়। এই ঘোষণাটির উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় বিখ্যাত সনদ-সিডও বা Convention on the Elimination, of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)[৮৪].

১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং এটি ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে ১৫০টির অধিক দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করে স্বাক্ষরদান করেছে। বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। তবে উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলের কয়েকটি ধারা বাদ দিয়ে একে আংশিক অনুমোদন করেছে[৮৫]।

৮৪. বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশে নারী সমাজের স্থিতিসত্তা ও আইনগত অধিকার, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা,* ঢাকা ঃ ১৯৯১, পৃ. ২৩।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এই কনভেনশন যা সিডও দলিলের মূল মর্মবাণী হলো-সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীরা যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে সেই ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা। এর জন্য প্রয়োজনানুযায়ী আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার, আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন, সনদে শরীক রাষ্ট্রগুলো তার দখল ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিডও এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এতে প্রয়োজনীয় নারী পরীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিডও অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহকে স্বাক্ষরদানে ২ বছরের মধ্যে তাদের দেশে নারীর বর্তমান অবস্থা, নারী উন্নয়নের বাঁধা এবং সনদের নীতিমালা অনুসরণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এরপর প্রতি ৪ বছর পর একই ধরনের রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক যোগ্যতার নির্বাচিত বিশেষজ্ঞের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব হলো এমন রিপোর্ট পরীক্ষা করা ও সিডও'র নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথ সুপারিশ করা। সিডও কার্যকরী পরিষদের সভা প্রতি বছর একবার অনুষ্ঠিত হয়।

একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন, বিশ্বের কল্যাণ এবং সার্বিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সকলক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে নারীর সর্বাধিক অংশগ্রহণ। এই কনভেনশন বা সিডও দলিলের মূল মর্মবাণী হলো সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে সে ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সঠিকভাবে গোটা বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা স্থাপন করা। এর জন্যে আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার, আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন সনদে শরীক রাষ্ট্রগুলো তাঁর সকল ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ[৮৬]।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমিক দিক থেকে বাংলাদেশ প্রথম দিকে ১৯৮৪ সালে ৬ই নভেম্বর এই সনদটি অনুমোদন করে যা প্রশংসার দাবিদার কিন্তু বাংলাদেশসহ অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহের একটি বিরাট অংশ উক্ত দলিলের উপর সংরক্ষণ জারি করেছে বা সাধারণ সংরক্ষণ দিয়েছে-যা সার্বিকভাবে সমতার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন ব্যাহত করেছে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যে বিদ্যমান তার প্রমাণ পাওয়া যায় অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা (১৩০টি রাষ্ট্র) এবং সংরক্ষণ জারি করা থেকেই।

বাংলাদেশ সনদের যে ধারা ও উপধারার উপর সংরক্ষণ জারি করছে, তা হচ্ছে ধারা ২, ধারা ১৩ (ক) ও ধারা ১৬.১ (গ) ও (চ)। এই সংরক্ষণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে "কুরআন ও সুন্নাহ"-র উপর ভিত্তি করে আইনের পরিপন্থী হওয়ায় সংরক্ষণ আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, সংবিধানের ১০,১৯,২৭,২৮ ও ২৯ নম্বর ধারায় নারীপুরুষের নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারীর পশ্চাৎপদতা ও উন্নয়নের জন্য ১০নং ধারায় সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। CEDAW দলিলে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের যে আহ্বান জানানো হয়েছে তা আমাদের সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার সাথে নীতিগতভাবে অভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে CEDAW এর ধারা-২, ১৩ (ক), ও ১৬ (গ) ও (চ) ধারাগুলো বাদ দেওয়া আমাদের শাসনতন্ত্রের সাথে অসংগতিপূর্ণ ও বিরোধপূর্ণ সদস্য-সিডও কমিটির সালমা খান, বাতিলকৃত ধারা-গুলো বিশ্লেষণ ও অনুমোদনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মূলত ২নং ধারায় বলা হয়েছে নারীর আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন চালু করা, প্রচলিত আইন সংস্কার সাধন করা, আইনগত অধিকারকে বাস্তবে কার্যকরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো চালু করা। বাংলাদেশে আইনগত ক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচলিত অনেক আইনের সংস্কার হয়েছে এবং নতুন আইনও চালু হয়েছে (যেমন ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইন, পারিবারিক কোর্ট প্রথা চালু, নারী নির্যাতন রোধ আইন)। তাই ২নং ধারাটি গ্রহণ করলে বাংলাদেশ শুধু এই অংগীকারই করছে ভবিষ্যতে আরও আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা হবে[৮৭]।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা নং-১৩ (ক)-তে বলা হয়েছে পরিবারে নারী পুরুষের সমান অধিকার। যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের মতে বাংলাদেশও বিশ্বাস করে যে, পরিবারে নারী পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশই এই ধারায় সংরক্ষণ জারি করেছে। ধারা নং ১৬ এর (গ) এবং (চ) উপধারাতে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সন্তানের অভিভাবকত্বে নারী পুরুষের সমান মর্যাদাও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সন্তানের কল্যাণ ও মংগলই চূড়ান্ত বলে উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, বেনিন, গ্যাবন, মালদ্বীপ, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশ এই সব ধারাগুলো অনুমোদন করেছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার ১নং ধারা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নারী পুরুষের বৈষম্যের অবস্থান ও তা দূর করার অংগীকার ব্যক্ত করেছে তাহলে অন্যান্য ধারাগুলো গ্রহণ না করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ২৬,২৭ ও ২৯ ধারা নারী পুরুষের সমতার নিশ্চায়তার কথা উল্লেখ রয়েছে- তাহলে অন্যান্য ধারাগুলো বাদ দিলে আমাদের সংবিধানের সাথে তা অসংগতিপূর্ণ ও বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়।

সিডও'র বিভিন্ন ধারায় সম্বলিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্যে উপযুক্ত আইন, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ একমাত্র রাষ্ট্রই নিতে পারে-সেদিক থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া সিডও কমিটির কাছে জাতীয় প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ সরকার সিডও বাস্তবায়নের জন্যে প্রশাসনিক জটিলতা আইনগত বাধা ও অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণের জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কারণ সিডও-এ ৯ ও ১৫ নং ধারার উপর যেহেতু সরকার সংরক্ষণ জারি করেননি, সেহেতু দেশের বিরাজমান অসম আইনসমূহ সংস্কার করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ নারীর অধিকার মানবাধিকার বলে বিবেচিত। এই প্রকৃতভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য সামাজিক পারিবারিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশসহ বাস্তবায়নের জন্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিশন গঠন করতে পারেন। তৃতীয়তঃ জনগণের স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ যে কোন কর্মসূচির বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। এর জন্যে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সচেতনতার। তাই সিডও'র ধারাসমূহ সম্পর্কে এদেশের পুরুষ নারী উভয়কে সচেতন করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থতঃ যে ধারাগুলোর উপর

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণ জারি করা হয়েছে সত্যিকার অর্থে যদি আমরা নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থা দূরীকরণ করতে চাই তাহলে সরকারকে সব সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে।

পঞ্চমতঃ সর্বোপরি যে কোন বিষয়ের বাস্তবায়নের উপর তার সার্থকতা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সরকারকে সিডও'র ধারাসমূহের বাস্তবায়নের কমিটমেন্ট থাকতে হবে। তেমনিভাবে থাকতে হবে রাজনৈতিক দলসমূহের এবং জনগণের।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বৈষম্যমূলক অবস্থা দূরীকরণের জন্যে এন.জি.ও গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু এন.জি.ও তৃণমূল পর্যায়ে সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে থাকে, তাই সিডও'র সনদের ধারাসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে নারীর অধিকার এবং সমতার প্রতি। শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপূর্বক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন করতে পারে। আইনগত অধিকার আদায় করার জন্যে নারীদেরকে সংগঠিত করতে পারে।

৩.৫.২ নাইরোবী সম্মেলন ঃ

জাতিসংঘের নারী দশক: সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এর সফলতা পরীক্ষা করা ও মান নির্ণয় করার জন্যে ১৯৮৬'র ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে নারীর অগ্রগামীতার জন্যে ভবিষ্যৎমুখী কলাকৌশল গৃহীত হয়। ১৯৮৫'র ১৩ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪০/১০৮ নং সিদ্ধান্ত দ্বারা এই প্রস্তাবনা অনুমোদন লাভ করে। কৌশলগুলোর আহবান হলো:

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সমতা

- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন
- আইনে সমান অধিকার
- বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদে সমান অধিকার
- প্রতিটি দেশে, সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কাঠামো গঠন করা।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা

- বৈবাহিক বা সামাজিক যে কোনো অবস্থানে সকল নারীর স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ ক্রয়, বিক্রয় ও পরিচালনার অধিকার থাকবে।
- ভূমি ঋণ, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ও আয় সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং এগুলোকে সকল প্রকার কৃষিভিত্তিক সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরন।
- উন্নয়নের প্রতিটি স্তর এবং পর্যায়ে নারীর সমান সুযোগ থাকবে।
- পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমতা অর্জনের লক্ষ্যে, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক সকল সংগঠনের ক্ষমতাসীন আসনে নারীর স্থান থাকবে।
- নারীদের মধ্যে উৎপাদনশীল সম্পদের সমবন্টনের প্রসারণ ও গণদারিদ্র্য হ্রাসকরণের পদক্ষেপ, বিশেষকরে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থাকালীন সময়ে, নেওয়া হবে।

নারীর অবৈতনিক কর্মের স্বীকৃতি

- ঘরে এবং বাইরে নারীর অবৈতনিক কর্মের মাত্রা ও মূল্যকে স্বীকৃতি প্রদান।
- জাতীয় আয় এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে নারীর বৈতনিক ও অবৈতনিক কর্মসমূহের অন্তর্ভূক্তিকরণ।
- গার্হস্থ্য দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া বিভিন্ন সেবামূলক উন্নয়ন যেমন-কর্মজীবী পিতামাতার জন্যে শিশু লালন-পালনের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে, কর্মদাতাগণকে উৎসাহ প্রদানমূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের জণ্যে উদ্বুদ্ধ করে, নারীর সন্তান লালন পালন, ও গার্হস্থ্য কাজের চাপ হ্রাসকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

- পিতা-মাতার মধ্যে সন্তান লালন-পালন ও গার্হস্থ্য দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করার জন্যে, সুবিধাজনক কর্ম সময় প্রতিষ্ঠিত করা[৮৮]।

নারীর বৈতনিক কর্মের উৎকর্ষতা

- সম কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ
- সমমূল্যের কাজের জন্যে সমান মজুরি
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মের মাত্রা ও মূল্যের স্বীকৃতি প্রদান
- কর্মস্থানকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে পুরুষ আধিপত্য বিশিষ্ট পেশাসমূহে যোগদানের জন্যে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করা এবং অপরদিকে মহিলা আধিপত্য বিশিষ্ট পেশায় পুরুষদের যোগদানের জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া
- কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকারসূচক আচরণ প্রদান করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মোট বেকারত্বের অসম অংশ থাকবে
- পর্যাপ্ত পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা ও বেকারত্ব সুবিধা প্রদান

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা

- স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সমান সুযোগ
- মা ও শিশুর জন্যে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা
- জন্ম বিরতিকরণের সিদ্ধান্ত ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা গ্রহণের জন্যে প্রতিটি নারীর অধিকার।
- অতি অল্প বয়সে সন্তান ধারণ নিরুৎসাহিত করা[৮৯]।

৮৮. সালমা খান কর্তৃক পঠিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সেমিনার, মে ৩০ও জুন ১, ১৯৯৪, ঢাকা ঃ পৃ. ২।
৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকতর উন্নত শিক্ষার সুযোগ

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সমান সুযোগ
- পাঠ্যসুচীকে যুক্তকরণ কল্পে বালিকা বিষয়ক পাঠকে বালক কর্তৃক এবং বালক লক্ষ্য পাঠকে বালিকা কর্তৃক গ্রহণের উদ্যোগ প্রণয়ন
- বিদ্যালয় থেকে বালিকাদের পড়া যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিতকরণ
- বয়স্ক নারীদের শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ ।

শান্তি প্রসারায়ন

- শান্তির প্রসারায়ন ও নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ।

২০০০ সালের জন্যে ন্যূনতম লক্ষ্য

- নারীর সমতা বাস্তাবয়নের গ্যারান্টি যুক্ত আইন প্রণয়ন
- প্রতিটি দেশে কমপক্ষে ৬৫ বছর পর্যন্ত মহিলাদের জীবন হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রসবকালীন মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ
- নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- কর্মসংস্থানের ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি।

৩.৫.৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১৯৯৩ সালে নারী অধিকার উন্নয়ন ও রক্ষার লক্ষ্যে ভিয়েনায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, নারী ও শিশু অধিকার হলো মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য, অখন্ড ও অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ নারী অধিকার লংঘন বলতে মানবাধিকার লংঘন বা জাতিসংঘ নারী অধিকার ঘোষণার প্রতি আক্রমন[৯০]।

৯০. মহিলা অধিদপ্তর, *ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মকৌশল, মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের রিপোর্ট*, ঢাকাঃ অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫.৪ বেইজিং সম্মেলন

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এতে গৃহীত পি.এফ.এ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৬ সালের মধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে এ ধরনের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহন করে। সিডা, ডানিডা এবং ইউনিসেফ এ কাজে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা নারীর ক্ষমতায়নে একটি এজেন্ডা, নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবী ভবিষ্যতমূখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর পরিপূর্ণ ও সমঅংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে সকল বাধা দূর করা ও এর লক্ষ্য। নারী এবং পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব সমভাবে ভাগ করে নেয়ার নীতি গৃহে, কর্মস্থলে এবং বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারী পুরুষের মধ্যে সমতা হলো মানবাধিকারের বিষয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি শর্ত। নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বিকশিত অংশীদারিত্ব হলো গণমুখী টেকসই উন্নয়নের একটি শর্ত। একুশ শতকের মুখোমুখি হয়ে সবকিছু মোকবিলায় নারী ও পুরুষ যেন নিজেদের তাদের সন্তানদের এবং সমাজের কল্যাণে একসাথে কাজ করতে পারে সেজন্য একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার খুবই জরুরী[৯১]।

কর্মপরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, নারী অভিন্ন বাধার অংশীদার, এর সমাধান করা যাবে একমাত্র পুরুষের সাথে সারা বিশ্বে জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করে। নারীর বিভিন্ন অবস্থাও পরিস্থিতিকে এই কর্মপরিকল্পনা সম্মান করে, মূল্য দেয় এবং মেনে নেয় যে, কিছুসংখ্যক নারী তাদের ক্ষমতায়নের পথে সুনির্দিষ্ট বাধার মুখোমুখি হয়।

---

৯১. মহিলা অধিদপ্তর, *মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন রিপোর্ট*, ঢাকা ঃ অধ্যায়-৩, দ্বিতীয় অংশ, অনুচ্ছেদ-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এই কর্মপরিকল্পনা দাবি জানাচ্ছে যে, মানবধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায্য ও মানবিক বিশ্ব গড়ার জন্য সকলের জরুরী এবং সম্মিলিত কাজ শুরু হোক। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব বয়সের সব মানুষের সমতার নীতিটিও এই কাজের ভিত্তি হিসেবে থাকবে।

৩.৬ বাংলাদেশের সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ[৯২]:

স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধস্ত বাংলাদেশে যখন পুনর্গঠনের কাজ চলছিল সে সময়ই নারী সমাজ দুটি ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। একটি হচ্ছে বিয়ের সময় যৌতুকের দাবী এবং অন্যটি হল বখাটে যুবকদের দ্বারা বিশেষ করে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের এসিড দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। ক্রমেই এ দুটি সমস্যা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নেয়। শুরুতেই সচেতন নারী সমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন একত্রিত হয়ে এই অপরাধের বিরূদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে N.B.W.R.P নামে একটি প্রতিষ্ঠান হয় এবং প্রনীত হয় ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন। এসিড নিক্ষেপকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয় এবং দন্ডবিধির ধারা ৩২৬ (ক) হিসেবে সংযুক্ত করে অপরাধীর শাস্তির বিধান করা হয় শুধু যৌতুক দাবীই নয় যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, চাকুরী বা কাজের লোভ দেখিয়ে শিশু ও নারী পাচার ইত্যাদি অপ্রতিরোধ্য হারে বাড়তে থাকে। সেই সাথে চলতে থাকে নারী সমাজের আন্দোলন ও আইন সংস্কারের দাবী। ১৯৮৪ তে শিশু বিয়ে নিরোধ আইনের সংশোধন আনা হয় এবং বর ও কনের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ বছর ও ১৮ বছর করা হয়, অন্যান্য আরো আইন ও সংশোধিত হতে থাকে। এর আগে বছরই প্রনীত হয় নারী নির্যাতন নিবৃত্তিমূলক শাস্তি অধ্যাদেশ ১৯৮৩। পরবর্তীতে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫। এই আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে ১৯৮৩ এর নারী নির্যাতন নিবৃত্তি মূলক শাস্তি রহিত করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ ও রহিত করা হয় "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০" প্রবর্তনের মাধ্যমে। ২০০৩ সালে এই আইনটিতেও প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয় এবং আজ পর্যন্ত এই আইনটি বলবৎ আছে।

---

৯২. রওনক জাহান মাহমুদা ইসলাম, *বাংলাদেশে নারী সহিংসতা*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ২০০৬, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন করা হয় বেগম রোকেয়া দিবস। ১৯৯৫ সালে বেগম রোকেয়া স্বর্নপদক প্রবতর্ন করা হয়।
- বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭-২০০০) একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে সংবিধান, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং জাতীয় শিশুনীতিতে প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়ন করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে জাতীয় শিশু নীতি অনুমোদিত হয় এবং ৫ই ডিসেম্বরকে ঘোষণা করা হয় জাতীয় শিশু দিবস।
- ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্লাটফরম ফর ত্র্যাকশন বাস্তবায়নে ১৯৯৮ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কমপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- সিডও অনুমোদন
- ১৯৯০ সালে মন্ত্রনালয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন।
- মাতৃত্বকালীন ছুটি তিন মাস থেকে ৪ মাসে উন্নীতকরন
- নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা সুবিধাসহ যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ও. সি. সি স্থাপন।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভি.জি.ডি.) কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ৫ লক্ষ পরিবারের নিকট ভি.জি.ডি. কার্ড বিতরনের মাধ্যমে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।
- কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ।
- ২০০১-২০১০ সালকে শিশু অধিকার দশক ঘোষণা ।
- নারীও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্ক সনদে স্বাক্ষর প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে অনেকটাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। যেমন জাতীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদপ্তর, ব্রাক, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, এসিড সাভাইভারস ফাউন্ডেশন (ASF), আইন ও শালিসী কেন্দ্র (ASK),নারীপক্ষ, উইমেন ফর উইমেন (WFW), ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (BILS) ও স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (STD) এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো।

৩.৬.১ নারী বিষয়ক শিক্ষা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেনস স্টাডিজ বিভাগ

দীর্ঘদিন ধরে নারী সমাজ, নারী বিষয়ক শিক্ষাকে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার দাবী জানিয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ বছর[৯৩] উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়েছে। এই বিষয়টি নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে- এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান আয়েশা বানু বলেন উইমেন স্টাডিজ বিভাগে সামাজিক বিজ্ঞান এর অন্যান্য ডিসিপ্লিনসহ কতগুলো বিষয়ে পড়ানো হয় যেমন নারী নির্যাতন, নারী ও পরিবেশ, নারী ও আইন, নারীর ইতিহাস, নারী স্বাস্থ্য বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য। সবগুলো বিষয়েই নারী অধিকার অন্তর্ভূক্ত আছে এবং এখানে শুধু ছাত্রীই নয় ছাত্র ও আছে। আবার প্রশ্ন রাখা হয়েছিল নারী নির্যাতন এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সহায়ক হচ্ছে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য? অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নটিতে তিনি জানান আমাদের আলাদা একটি কোর্স আছে "নারীর প্রতি সহিংসতা"। ছাত্র-ছাত্রীরা আগে অনেক কিছুই জানতনা নির্যাতন মানে বুঝতো ধর্ষণ, নির্যাতন মানে হচ্ছে যৌতুকের জন্য হত্যা। নির্যাতনের যে একটা সাইকোলজিক্যাল দিক আছে কিংবা পরিবারিক নির্যাতন ও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা তারা জানত কিন্তু প্রকাশ করতনা, এই বিষয়গুলো জানার পর তারা আরও সচেতন হয়েছে এবং যৌন নিপীড়নের ব্যাপারেও সচেতন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এরকম কোন ঘটনা ঘটলে তারা কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করে। এছাড়াও এখানে 'Gender and law'একটা কোর্স আছে যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা আইন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

---

৯৩. ২০০০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ে উইমেন্স স্টাডিজ নামে নতুন বিভাগ চালু হয়। (গবেষক পরিচালিত জরীপ)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.২ বেগম রোকেয়া ও তসলিমা নাসরিন এর নারীবাদ- একটি তুলনামূলক আলোচনাঃ

● বেগম রোকেয়া শুধু অনৈসলামী অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও মুসলিম নারী শিক্ষারই অগ্রদূত ছিলেন না, তিনি বাঙালী মুসলমানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও মজবুত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন বিকাশমূখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে। ইসলামী মুল্যবোধসম্পন্ন কল্যাণমূখী সমাজ গঠনই ছিল তার আদর্শ। বাঙালী মুসলমান সমাজের যে মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন ৭০-৭৫ বছর পরেও রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখা করেছেন। জনমনে তাঁর সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর বক্তৃতা বিবৃতি ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুই তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে নারী জাগরনে তাঁর মূল কয়েকটি নিবন্ধ ও ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্বৃত করছি। কিন্তু তার আগে তার পরিচয় সম্পর্কে লিখার প্রয়োজনবোধ করছি।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে রোকেয়ার জন্ম। পড়ন্ত এই জমিদার বাড়ির রক্ষণশীলতা ছিল নির্মম এবং অমোঘ। শৈশব থেকে রোকেয়া অবরোধবাসিনী। পিতার বহুবিবাহ ও অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ এবং অবরোধ প্রথার প্রতি মাতার প্রগাঢ় আসক্তি মনে হয় তাঁদের সাথে রোকেয়ার কিছুটা আত্মিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই দূরত্ব পুষিয়ে দিয়েছিল দুই ভাইয়ের সাথে বিশেষ করে বড়ভাই ইব্রাহীম সাবেরের সাথে নৈকট্য, আত্মার এবং স্নেহের বন্ধন। বড় বোন করিমুননেসার অপার স্নেহে সিঞ্চিত হয়েছেন রোকেয়া। ছোট বোন হুমায়রার প্রতি রোকেয়ার ছিল অগাধ ভালবাসা।

তাঁর সামনে জ্ঞান ভান্ডার উন্মোচন করেন, জ্ঞান অর্জনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন ভাই ইব্রাহীম সাবের ও বোন করিমুননেসা। এ সবই পরিবারের অভিভাবকদের অলক্ষ্যে বা তিরষ্কার সত্ত্বেও। রোকেয়ার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পতনোন্মুখ আভিজাত্যের ভ্রান্ত মূল্যবোধে নিয়ন্ত্রিত নিয়ম কানুনের মধ্যে, - যে জীবনের অসারতা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও অবরোধ থেকে মুক্তির আকাঙ্খা তাঁর জীবনের - শৈশব ও কৈশোরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও অনুভূতিলব্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিয়ে হয় তাঁর বাইশ বছরের বড় সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। উচ্চশিক্ষিত সাখাওয়াত হোসেন কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুতে অকালে বিধবা হন রোকেয়া। এর মধ্যে তিনি হারিয়েছেন দুটি সন্তানকে। স্বল্পস্থায়ী বিবাহিত জীবনে তিনি নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছেন। স্বামীর উৎসাহ জ্ঞানপিপাসু রোকেয়াকে প্রেরণা জুগিয়েছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত করার, সুযোগ করে দিয়েছে সাহিত্য চর্চার। জ্ঞান অর্জন ও সাহিত্য চর্চার এই অভিজ্ঞতা এবং স্বামী প্রদত্ত দশ হাজার টাকা পুঁজি করে রোকেয়া তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই জীবন যেন তাঁর জন্য পূর্বনির্ধারিতই ছিল। মুসলমান সমাজের ক্ষতস্থান উন্মোচন করে তা নিরাময়ের লক্ষ্যে নিজেকে নিবেদিত করার জন্য যেন শৈশব, কৈশোর, বিবাহিত জীবন ও বৈধব্য তাঁকে প্রস্তুত করেছে। তাঁর এই সংস্কার প্রচেষ্টায় প্রধান্য পেয়েছে নারী-পুরুষে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করে সমকক্ষতার ভিত্তিতে সমাজ ও সংসার পুনর্নির্মাণের বিষয়টি[৯৪]।

স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমে ভাগলপুর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে স্বামীর প্রথম পক্ষের মেয়ের বিদ্বেষের কারণে থাকতে পারেন নি বেশি দিন। কোলকাতায় নিয়ে আসেন স্কুল। অযৌক্তিক পর্দা প্রথা ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধে আবদ্ধ রক্ষণশীল সমাজের মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতে তাঁকে অনেক সামাজিক গঞ্জনা পোহাতে হয়েছে। স্কুলের উন্নয়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থায়নে সমাজ, সমাজপতি বা সরকারের কাছে থেকে সাড়া পাননি। তিনি অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম দ্বারা প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছেন, স্কুলের গোড়াপত্তন করেছেন, যেটা আজও তাঁর স্মৃতি ধারণ করে আছে। পরম স্নেহ দিয়ে ছাত্রীদের তত্ত্বাবধান করেছেন। নারীর পূর্ণ প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমে বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করেছেন আপন বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

---

৯৪. উদ্ধৃতিঃ মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য*, ঢাকা ঃ ৩৯, বাংলাবাজার, ১৯৯৬, পৃ. ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম পড়ে মনে হয় সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য তাঁকে লেখনী ধরতে তাগাদা দিয়েছে। অবরোধ প্রথার কুফল, নারীর অধস্তনতার কারণ ও তা থেকে মুক্তির উপায়, নানাবিধ সামাজিক অনাচার যা শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু সমাজেও নারীকে নির্যাতন ও বঞ্চনার যাঁতাকলে আটকে রেখেছে, এসবই ছিল তাঁর রচনার মূল বিষয়। তাঁর সমালোচকদের ভাষায় তিনি সমাজ/পুরুষকে 'কষাঘাত' করেছেন তাঁর লেখনীর তীব্রতায় ও বিষয়বস্তু চয়নে।

এ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে রোকেয়ার কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে মনে হয় নারীকে পুরুষের সমকক্ষতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে তিনি সচেতনভাবে তিনটি কৌশল প্রয়োগ করেছেনঃ সাহিত্য কর্ম, নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। আঞ্জুমান-এ-খাওয়াতীন-এ-ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে। ক্রমে কোলকাতা ছাড়িয়ে বাইরের শহরগুলিতেও আঞ্জুমান-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে দুঃস্থ নারীদের সহায়তা করা হতো, স্বনির্ভর হবার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বাঙালী মুসলমান নারী সমাজকে একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানোর বোধ হয় এটাই প্রথম প্রয়াস। একক ব্যক্তিসত্তা থেকে সংগঠিত শক্তি যে সমাজের কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরে অধিকতর ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা রাখে, একক কণ্ঠস্বর অপেক্ষা সমন্বিত বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে সক্ষম এ উপলব্ধি তাঁর ছিল[৯৫]।

নারী পুরুষের সমকক্ষতার ভিত্তিতে সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে রোকেয়াও সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলায় মুসলিম নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে রোকেয়ার আবির্ভাব। নবজাগরণের উন্মেষ সমাজে বিরাজমান ভেদাভেদ ও কুপ্রথাকে প্রতিহত করে উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত চিন্তার প্রতিষ্ঠাকল্পে ঘটেছিল। সাহিত্য-কর্ম দ্বারা রোকেয়া সচেতনভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন, সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

---

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

একজন নারী হিসাবে সমকালীন সমাজে নারীর প্রতি যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান ছিল, রোকেয়ার ব্যক্তি জীবনের প্রগাঢ় উপলব্ধি থেকে তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল অনেক বিস্তৃত, তাঁর লেখনী অবলীলায় বিচরণ করেছে বিবিধ ক্ষেত্রে। তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে তাঁর প্রথম প্লেনে ভ্রমণের হাস্য-রসাত্মক উপাখ্যান। স্থান পেয়েছে প্রচণ্ড বিপ্লবাত্মক কল্পকাহিনী সুলতানার স্বপ্ন, যার মাধ্যমে তিনি পুরুষকে অবরুদ্ধ এবং নারীকে বহির্জগতে বিচরণকারী, সৃষ্টিধর্মী, বিজ্ঞান মনস্ক, ন্যায়পরায়ণ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মুসলমান সমাজের সংস্কার বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ছাড়াও হিন্দু সমাজে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্যও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিমা সমাজেও নারী কত অসহায়। দুটি কাল্পনিক চরিত্র- বৃটিশ রমণী 'ডেলিশিয়া' ও বঙ্গ ললনা 'মজলুমার' প্রতি পুরুষ সমাজের নির্মমতার করুণ চিত্রের চিরায়ত রূপ একই- শিক্ষা সম্পদ, প্রতিভা, সংস্কৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও। সমাজ সভ্যতা নির্বিশেষে নারীর অধস্তন অবস্থানের সার্বজনীনতার উপলব্ধি তাঁকে নারী মুক্তির তাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যষ্টিক বিশ্লেষণের যোজনায় সমষ্টিক উপপাদ্য রচনা এবং সমষ্টিক ধারণার প্রয়োগযোগ্যতা, - তত্ত্ব নির্মাণের এই উপাদান রোকেয়ার রচনায় পরিস্ফুট।

"... পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমরা এরূপ দাসী ছিলাম না। মানুষ যেমন ক্রমে সভ্য হইয়াছে,... তেমনই ক্রমে বাহুবলে, ও বুদ্ধি কৌশলে নারী জাতির উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ... যে সমাজ রাজা ও প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, পুরুষ প্রভু ও বড়লাট প্রভুর প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে। ...বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে নারীকে তাহারা অধীনতা পাশে বাঁধিয়াছে[৯৬]।"

৯৬. উদ্ধৃতি ঃ মালেকা বেগম, *মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া স্বদেশী ও স্বাদেশিক*, ঢাকা ঃ ২০০৮, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নারী তার অধস্তনতা ও বশ্যতাকে আত্মস্থ করেছে এবং এর থেকে মুক্তির কোন স্পৃহা তার মধ্যে নেই। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কেবল উপার্জনকারী হবার কারণেই যে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করে তা নয়। তাঁর ভাষায়ঃ

"... যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচীকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা উপার্জন করিয়া পতি ও সন্তান পালন করে, সেখানেও ত ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভূত্ব করেন, এবং লেডী ডাক্তার প্রমুখ সমাজের মান্য-গণ্যা কামিনীগণ স্বয়ং জীবিকা উপার্জন করিয়াও 'স্বামী' নামক ব্যক্তির বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বামিটি যাহা ইচ্ছা তাই করিবেন, স্ত্রী তাহার বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইবেন না কেন? ইহার কারণ এই যে, নারীর অন্তর, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাদের স্বাধীনতার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না[৯৭]।"

এভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন নারীর পশ্চাদপদতার প্রেক্ষাপট, নির্ণয় করেছেন নারীর বশ্যতার কারণ। পুরুষের স্বামীত্ব তথা প্রভূত্ব ও স্ত্রী হিসেবে নারীর দাসত্বের সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর প্রতিবাদী অবস্থান। তিনি পুরুষতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।

নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র রোকেয়ার লেখনীতে ধরা পড়েছে। ঐ নির্যাতনের অস্ত্র ছিল অবরোধ প্রথা। অবরোধ প্রথা নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব এবং মালিকানার মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর জন্যে স্বনির্ভরতার সকল সম্ভাবনার দ্বার করে অবরোধ প্রথা নারীকে চির অসহায়ত্বের মধ্যে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। অসহায়ত্বের কারণে নারী নির্যাতিত হয় পরিবারের গন্ডীতে, সেটা স্বামীর গৃহেই হোক বা পরিবারের অন্য পুরুষ অভিভাবকের অধীনেই হোক। রোকেয়া যুগে এভাবে সমাজের অলক্ষ্যে অন্তঃপুরবাসিনী নির্যাতিত হতো। বর্তমান যুগে নারী অন্তপুরের বাইরে পা রাখছে। সুতরাং নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতার রূপ পাল্টাচ্ছে এবং পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই, নারীর জীবন ও দেহের নিরাপত্তা বর্তমানের নারী আন্দোলনের একটি প্রধান ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব পায়।

---

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নারী আন্দোলনের যে মুল ধারা এদেশে, যাকে উদারনৈতিক নারীবাদ বা লিবারেল ফেমিনিজম বলা চলে, সেই ধারার সাথে রোকেয়ার মিল এখানে যে, তিনি পুরুষের সাথে সমকক্ষতাকে নারীর উন্নতির সমার্থক হিসাবে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়,

"আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্যে পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এই উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতি আদর্শ।"
অবশ্য এর পাশাপাশি, বর্তমানে এই ধারণাও এদেশে নারী আন্দোলনের বৃহত্তর অঙ্গনে ক্রিয়াশীল যে পুরুষের সাথে সমতা অর্জন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য নয়, নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি এবং সেই সাথে নারীর মানবাধিকার অর্জন আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

নারীবাদের আলোচনায় সামাজিকীকরণ ও ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারী এক ধরনের হীনমন্যতার শিকার, আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রোকেয়ার ভাষায়,

"আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই আমরা এখন অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি, এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি।"

নারী আন্দোলনের তাই প্রয়াস নারীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী করে তোলার। নারীর সামর্থ্য বা ক্যাপাসিটি তৈরি করে, নারী সম্পর্কে সমাজের ইতিবাচক চরিত্রায়নের পক্ষে নারী আন্দোলনের অবস্থান[৯৮]।

সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের একটি প্রধান দাবি। বর্তমানে এই দাবি সম-উত্তরাধিকারের দাবিতে পরিণত হয়েছে। রোকেয়া তার সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। ইসলাম ধর্মগ্রন্থে নির্ণিত পুত্রের অর্ধেক কন্যার প্রাপ্য সত্ত্বেও নানা কৌশলে তাদের বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি আক্ষেপের ভাষায় লিখেছেন- "হায় পিতা মোহাম্মদ (দঃ)। তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে

৯৮. উদ্ধৃতিঃ আব্দুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা ঃ ১৯৭৩, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে। আহা "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখা রূপে পুস্ত কেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে[৯৯]।"

নারী-শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের নারী আন্দোলন তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অক্ষর ও সংখ্যা জ্ঞানের সাথে বৈষম্য সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টির প্রয়াস নিচ্ছে। নারীর তথা সমাজের উন্নয়নের জন্য রোকেয়া নারী-শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। যে যুগে নারী ছিল অবরোধ বাসিনী, অন্তঃপুরবাসিনী, সে যুগে নারীকে কর্মজগতে প্রবেশ করার জন্যে রোকেয়া উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষক বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী জীবিকা অন্বেষণ করবে, এ স্বপ্ন তাঁর ছিল। কন্যাকে শিক্ষিত করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। রোকেয়া তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। যে যুগে কঠিন অবরোধ প্রথার কারণে, একটি বালিকা শিশুকে চিলেকোঠায় প্রায় সারাদিন হয়তোবা উপবাসে থাকতে হতো, সেই যুগে জন্ম নিয়েও রোকেয়া চিন্তা করেছেন নারী বর্হিজগতের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। আজকের নারী আন্দোলন নারীর প্রতিভা বিকাশে সম সুযোগের দাবি করে এবং সকল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার তাদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে।

গৃহকর্মে নারীর শ্রম বিনিয়োগের কোন মুল্য দেয়া হয় না, এ সম্পর্কে রোকেয়া লিখেছেন... "যে পরিশ্রম আমরা (কলুর বলদের মত) স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি (যাহার মূল্য নাই, বেতন নাই) সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?"

---

৯৯. উদ্ধৃতি ঃ সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকাঃ বুলবুলি পাবলিশিং হাউজ, ২০০২, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে বলা চলে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন বিবাহিত জীবনে গড়ে তোলা পারিবারিক সম্পদে স্ত্রীর সম অধিকারের যথার্থতা দাবি করে থাকে। স্বামী পরিবারে 'উপার্জনকারী' হবার কারণে "সম্পদ সৃষ্টিকারী" হিসেবে সম্পূর্ণ সত্ত্ব ও মালিকানা দাবি করেন, যদিও সংসারে নারীর শ্রমও সেবার বিনিয়োগ এই সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। রোকেয়া এ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন যে শ্রমজীবি নারী পুরুষ অপেক্ষা কম মজুরি পায়।

রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। নারী শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক কৌশল হিসেবে এবং নারী সমাজের অবস্থাও দাবি তুলে ধরার জন্যে তিনি সংগঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান বা 'মহিলা সমিতি'র মঞ্চ থেকেই রোকেয়া সর্বপ্রথম মহিলা সমাজের মধ্যে পরস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গোটা সমাজের পরিস্থিতির চিত্র ও সমস্যাবলী চিত্র ও সমস্যাবলী সম্যকভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে আজকের নারী আন্দোলন নিয়োজিত। আঞ্জুমানের কার্যপরিধি ব্যাপৃত ছিল দুঃস্থ অসহায় নারীকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর করে তোলার প্রয়াসে। বর্তমানের নারী আন্দোলন নিয়োজিত 'উন্নয়নমূখী' কর্মকান্ডে, নারীর স্বয়সম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে, সামর্থ্য সৃষ্টিতে। রোকেয়া আহ্বান জানিয়েছেন নারী সমাজকে-

"তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর[১০০]।"

নারীকে তার স্বতন্ত্র সত্তার চেতনায় সমৃদ্ধ করতে সংগঠনের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজেকে জড়িত করেছেন বিভিন্ন সমিতির কর্মকান্ডে, প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করেছেন নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির বার্তা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে। তিনি কেবল নারী অধস্তনতার বিশ্লেষণ করে এদেশের নারী আন্দোলনে তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত রচনাই করেননি, আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন।

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নারী মুক্তির আন্দোলনের তাত্ত্বিক কেবলমাত্র ছিলেন তা নয়- নারী মুক্তির স্বপ্নই শুধু দেখেছেন তাও নয়। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশিত মুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরই নির্ণিত কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি এর যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। অবউন্নয়নের অবস্থান থেকে উত্তরণ কল্পে নারী শিক্ষার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার উদ্দেশ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন। তাঁর লেখনী তাঁর জীবনের উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করেছে। জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত সাহিত্যকর্ম কখনও রূপকের মাধ্যমে, কখনও ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি করে, কখনও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি চিত্রিত করেছেন নারী আন্দোলনের মৌলিক ভিত-নারীর অধস্তনতা ও বশ্যতার সার্বজনীনতা,-দেশ, কৃষ্টি, সংস্কার, শিক্ষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও নারীর জীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আর তা হলো পুরুষ আধিপত্য ও নিষ্পেষণ। সাহিত্য দ্বারা তিনি নারী পুরুষের সমতা ও সমকক্ষতার আদর্শের বার্তা পৌছিয়েছেন[১০১]।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাঁর বিরোধ ছিল নারীর অধস্তন ও অবরুদ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করে। যে সমস্ত বিষয় তাঁকে আরও বিতর্কিত করে তুলতে পারত, বা নারীমুক্তির প্রসঙ্গে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করার সম্ভাবনা রাখতে পারত সেই সমস্ত প্রসঙ্গ তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি বিরুদ্ধতা করেছেন পর্দার সামাজিক রূপান্তরের যার ফলে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। বারবার তিনি ধর্মীয় নীতি এবং ধর্ম-উদ্ভূত আচার-প্রথার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন,-তিনি ধর্মের বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন ধর্মান্ধতার বিরোধী। তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। রোকেয়া সরাসরি নিজ কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মাত্রা যোগ করেননি। এভাবেই বোধ হয় তাঁর কালোত্তীর্ণ হবার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। এ কারণেই একবিংশ শতকেও তাঁর জীবন ও কর্ম বাংলাদেশের নারী আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়।

---

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

● এবার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের লেলিয়ে দেয়া কুখ্যাত বিকৃত রুচির তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি। তসলিমা নাসরিন কিছু সনাতন বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার জন্যে হুট করে আলোচনায় আসেন। আদতে সাহিত্য গুণে তার অবস্থান শূন্যের কোঠায়। লেখালেখির বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ধর্ম ও পুরুষকে। পুরুষ বিদ্বেষী তসলিমা এক জায়গায় লিখেছেন, "ওরা জেরুজালেমে, হিমালয়ে, হেরা পর্বতে বসে ধর্ম রচনা করছে। এই ধর্মকে ওরা পবিত্র ঘোষণা করেছে। ওরা তোমাকে শয্যায় উঠাচ্ছে, শয্যা থেকে যখন ইচ্ছে নামাচ্ছে। ওরা তো মানুষ নয় ওরা পুরুষ[১০২]।"

"নারী ধর্ষণ করতে শিখুক ব্যাভিচার করতে অভ্যস্থ হোক.... এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয় ... নারী যতোদিন ছিড়ে খুঁড়ে পুরুষ না খাবে নারী যতোদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্তে গ্রহণ না করবে ততোদিন নারীর রক্ত-মাংস-মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দূর হবে না"।

সুলেখক আবদুল মবিন প্রণীত 'নষ্ট দর্শন' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অন্নদা মঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মানসিংহের যুদ্ধকালে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্রাহ্মণ মানসিংহকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রতিদান হিসেবে মানসিংহ ঐ ব্রাহ্মণকে একটি জায়গীর দেওয়ার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথমে ঐ অনুরোধ রক্ষা করেননি। ফলে ব্রাহ্মণ পূজাদ্বারা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুশী করলে অন্নপূর্ণা জ্বীন-ভূত-প্রেত ও পিচাশের বলে বলিয়ান হয়ে রাজমহলে বেগমদের উপর সওয়ার হয়ে উৎপাত শুরু করলে সম্রাট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হন।

---

১০২. উদ্ধৃতি ঃ সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০১, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্নদা মঙ্গলকাব্যে এই উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

"বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল
ওঝার ধর্মকে বিবির ইজার ছিড়িল
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত
বিবিরে লইয়া ভূতের খুশী বাড়ে ততো।
বিবি ছাড়ি বান্দিরেও যেই ধরিল ভূতে
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে।
এমন খবিস কাম না শুনি কোথায়
তাবিজ ছিঁড়িয়া বিবি ওঝারে কিলায়[১০৩]।

ব্রাক্ষণ ভবানন্দ মজুমদারের লেলিয়ে দেয়া অন্নপূর্ণার ঐ উৎপাত ছিলো সম্রাটের বিরুদ্ধে আর পাশ্চাত্যবাদী ও নব্য ব্রাক্ষণদের লেলিয়ে দেয়া তসলিমার উৎপাত হচ্ছে ইসলাম ও সভ্যবোধের বিরুদ্ধে।

এই উগ্র নারীবাদী, নাস্তিক এবং উচ্ছৃংখল যৌনাকামী তসলিমা নাসরিন কয়েকজনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং উচ্ছৃংখল ও ইসলাম বিরোধী অনুশাসনে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাই এই পুরুষ বিদ্বেষী তসলিমা পুরুষদের একাধিক স্বামী, মেয়ে বেশ্যালয়ের মতো পুরুষ বেশ্যালয় স্থাপন এবং তসলিমার ভাইয়ের ন্যায় শরীরের কাপড় খুলে প্রকাশ্যে উঠানে বসার, পুরুষের ন্যায় প্যান্টের বোতাম (শাড়ী উঠিয়ে নয়) খুলে প্রস্রাব করার দাবি জানিয়েছেন। এ মহিলা আক্ষেপ ও বিক্ষুব্ধতার সাথে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। নারীদের জাগ্রত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদর্শিত ধর্ম ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ ও উপহাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

১০৩. উদ্ধৃতি ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালে তথাকথিত এই নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন লিখেছেনঃ "সভ্যতার শুরু থেকে সমাজ ও ধর্ম মানুষকে পরিচালিত করেছে, আর সমাজ ও ধর্মের পরিচালক হিসেবে যুগে যুগে পুরুষরাই কর্তৃত্ব করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র তো বটেই, নারীকে সবচেয়ে বেশি অমর্যাদা করেছে ধর্ম। কোনো ধর্মের আশ্রয়ে নারীর ওপর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন কিছুটা সহনীয় করে বিধি-নিষেধ আরোপ করবার জন্য নতুন ধর্মের আহবান আছে। বৌদ্ধ ধর্মের শুরুতে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে লাখ লাখ নারী ভিক্ষুণী সংঘে আশ্রয় নিয়েছিলো। জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী আগুস্ট বেবেল তাঁর 'উওম্যান ইন দ্য পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার' গ্রন্থে লিখেছেন-'খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব হলে অন্য সব দুর্ভাগাদের মতো নারীরাও তাদের দুরাবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই ধর্মের প্রতি খুব আগ্রহী ও অনুরক্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম নারীর জীবন থেকে দুর্দশা দূর করতে পারেনি। এই ধর্ম নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকতে বাধ্য করলো। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলেছেন-'জেসাস ক্রাইস্ট নারীর অধিকার বলতে কিছু দেননি। দাসীবৃত্তি ছাড়া নারীর আর কোনো কাজই সমাজে ও ধর্মে নির্দেশিত হয়নি"[১০৪]।

এভাবে তসলিমা নাসরিন অন্যান্য ধর্মের সাথে মানবতার মহান ধর্ম ইসলামকে একাকার করে নারী নির্যাতনের জন্য ইসলামকে সমভাবে দায়ী করেছেন। বিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে টেনে এনে ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হেনেছেন। ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে মানব কল্যাণে যে সব বিধি-বিধান আরোপ করেছে তা বিজ্ঞানসম্মত বলে আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ এই কুখ্যাত বিকৃত রুচির মহিলা আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করে বাস থেকে নেমে ছেলেদের ন্যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাপড় উঠিয়ে প্রস্রাব করার অধিকার চান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আইন কানুনে নারী-পুরুষের অসঙ্গতি প্রসঙ্গে পবিত্র গ্রন্থগুলোর সংশোধন চান।

---

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প রয়েছে। গল্পটি হলো [১০৫]ঃ

তসলিমার ন্যায় একজন নাস্তিক বুদ্ধিজীবী ছিলো। এ বুদ্ধিজীবী প্রায়ই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতেন। সৃষ্টির অনেক অসঙ্গতি নিয়ে আল্লাহ্‌র তীব্র সমালোচনা করাই তার কাজ ছিলো। যেমন বিরাট এক কুল গাছে ছোট্ট একটি ফল অথচ মাটিতে নুয়ে পড় ছোট্ট লাউ গাছে ইয়া বড় বিরাট এক ফল।

একদিন এ বুদ্ধিজীবী প্রকৃতির ডাকে কুল গাছের নিচে বসে যান। সে সময় হঠাৎ একটি কুল বুদ্ধিজীবীর মাথায় পড়ে। কুলটি মাথায় পড়ার পর মূহূর্তেই নাস্তিক বুদ্ধিজীবীর হুশ হয়। তখন সে চিন্তা করে কুল গাছে যদি ছোট্ট কুল না হয়ে লাউ হতো তবে আজকেই আমার জীবন লীলা সাঙ্গ হতো।

সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অত্যন্ত নিখুঁত নির্ভুল ও যথার্থ। মানুষের সীমিত জ্ঞানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিষয় না বুঝার কারণে অসঙ্গতি খুঁজে সমালোচনা করে। তবে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে এইসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়। তাই নারী অধিকার এর নামে তসলিমা নাসরিনের যে আন্দোলন তা মুসলিম হিসাবে মেনে নেয়া অন্যায়।

---

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ শিশু অধিকার সনদ

শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালে জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিনত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৯১টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করে। প্রথম যে সব দেশ এই চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি।

৩.৭.১ শিশু অধিকার গুচ্ছ

এ গুচ্ছে ১-৫৪ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সনদের অধিকারগুলোকে ৪টি গুচ্ছে ভাগ করা যায় বেঁচে থাকার অধিকার এর মধ্যে রয়েছে জীবন ধারনে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার যেমন-স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

বিকাশের অধিকার এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার, শিশুর গড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত একটি জীবন যাত্রার মান ভোগের অধিকার এবং অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। সুরক্ষার অধিকার এই শ্রেনীতে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকারসমূহ যেমন শরনার্থী শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশু[১০৬]।

অংশগ্রহনের অধিকার এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, অন্যদের সঙ্গে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার এবং তথ্য ও ধারণা চাওয়া পাওয়া ও প্রকাশের অধিকার।

---

১০৬. গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.২ চারটি মূলনীতি

এই সনদে ৪টি মূলনীতি রয়েছে যা এর বিধানগুলো ব্যাখ্যাও প্রয়োগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষম্যহীনতা

সকল শিশুর লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, গোত্র, বর্ণ, শারীরিক সামর্থ, অথবা জন্মের ভিত্তিতে কোনরকম বৈশিষ্ট্য ছাড়াই সনদে বর্ণিত অধিকার সমূহ ভোগের অধিকার রয়েছে।

শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ

মা, বাবা, সংসদ, আদালত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করবেন।

শিশুর অধিকার রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব

সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মা-বাবার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। শিশুর বয়স এবং পরিপক্কতা অনুসারে তাকে পরিচালিত করতে হবে। এই নীতিতে যে ধারনাটি তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে শিশুদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং শিশুদের পরিচালনার সময় এসব অধিকার তারা কিভাবে প্রয়োগ করবে তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নিজের মতামত গঠনের উপযোগী বয়সের শিশুর নিজস্ব বিষয়ে অবাধে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। শিশুর মতামত কতটা গুরুত্ব পাবে তা নির্ভর করবে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার উপর। ঘরে এবং স্কুলে প্রতিদিন যেসব সিদ্ধান্ত মুখে মুখে নেয়া হয়, তার সকল ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য[১০৭]।

---

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.৩ বিশ্ব শিশু সম্মেলন

ক) বিশ্বশিশু সম্মেলন ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস, যখন সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আশাবাদের ঢেউ চলছিল, ততদিনে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং এরকম একটি ব্যাপক প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে যে, অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হতো তা এখন "শান্তির লভ্যাংশ" হিসেবে মানব উন্নয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে। এক নজীরবিহীন সংখ্যক দেশের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্ব শিশু সম্মেলন উপলক্ষে নিউইয়র্কে সমবেত হয়েছিলেন। বিশ্ব শিশু সম্মেলনে শিশুদের জন্য বিশ্বের আশা আকাংখা প্রতিফলিত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, যা সম্মেলনের মাত্র আগের বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয় এতে শিশুদের স্বার্থের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

খ) ২০০১ সালের মার্চ থেকে সারাবিশ্বে জাতীয়ভাবে "শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন" কার্যক্রমের সূচনা অনুষ্ঠানগুলি তাদের বৈচিত্র্য ও উচুঁমাত্রার গুরুত্ব উভয়কারণেই চমকপদ ছিল। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, তারকা, সঙ্গীতশিল্পী ও ক্রীড়াবিদ, ধর্মীয় নেতা ও লেখকরা সবাই "শিশুদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্বের পরিবর্তন" এই অভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে হাজার হাজার শিশুর সাথে যোগ দেন[১০৮]।

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারী ও শিশু অধিকার

৪.১ শিশু অধিকার ও ইসলামঃ

শিশুরা আগামী দিনের কর্ণধার। তাদের সঠিক বিকাশের উপরই নির্ভর করে জাতির আশা আকাংখার বাস্তবায়ন। মহানবী (সাঃ) এর অন্তর জুড়ে ছিল শিশুদের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা। তিনি শিশুদের অধিকার সংরক্ষন তাদের শরিরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি যে সব দিক নির্দেশনা ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বিশ্বের ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হত। মানুষ কন্যা সন্তান জন্মের লজ্জা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য শিশুটিকে হত্যা করতো। মানুষ যাতে কন্যা সন্তানকে অবেহলার চোখে না দেখে সেজন্য মহানবী (সাঃ) পিতামাতাকে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন 'তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কন্যা সন্তানই উত্তম। যে ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তানের ভরণ পোষণ করেছে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে।' [১]

ইসলাম মানবশিশুকে চোখ জুড়ানো আত্মপরিতৃপ্তকারী সম্পদ বলে বিবেচনা করে থাকে। ইসলাম শিশুদের বিকাশ শিক্ষা দীক্ষা চরিত্র গঠন সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা, পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে সমতা বিধান কল্পে যে ইতিবাচক মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা একক ও অনন্য। আজ থেকে পনেরশ বছর আগে যখন বিশ্বের কোন জাতি গোষ্ঠীর কণ্ঠে শিশু অধিকার সম্পর্কে একটি বাক্য পর্যন্ত উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি, সে সময় মানব জাতির সুমহান শিক্ষক মহানবী (সাঃ) শিশুদের আদর যত্নের কথাই বলেননি শিশুকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশসহ এখন কোন দিক নেই যা তার পবিত্র শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠেনি।

দীর্ঘকাল পরে জাতিসংঘ শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে শিশু অধিকর সনদ প্রনয়ন করেছে তাতে আমরা শিশুদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর যেসব মহান শিক্ষা ও অদর্শ তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজ থেকে পনেরশ বছর আগে, ষষ্ঠ শতকে মহানবী (সাঃ) শিশু অধিকার বাস্তবায়নে যে শিক্ষা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। তা যদি বিশ্বের সর্বত্র প্রতি পালিত হতো, তবে বিংশ শতাব্দীতে এসে জাতিসংঘকে নতুন করে শিশু অধিকার সনদ প্রনয়নের প্রয়োজন হতো না।

---

১. উদ্বৃতিঃ নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *শিশু অধিকার ও মহানবী (সাঃ)*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম ইসলাম শিশুর অধিকার নিশ্চিত করেছে। পরবর্তীতে বিশ্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত সনদে শিশুর ৫৪টি কল্যাণকর ধারা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র এসব ধারা বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ইসলামে শিশুর অধিকার ও মতামতের স্বাধীনতা চিরন্তন ও শাশ্বত। ইসলাম প্রদত্ত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শিশুরাই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। সন্তান জন্মের পর প্রাথমিক পর্যায়ে পিতামাতার কতগুলোর আমল (কাজ) কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

মহানবী (সাঃ)-এর ভাষায় প্রধান তিনটি আমল হল ১. জন্মের পর পরই একটি উত্তম নাম রাখা। ২. জ্ঞান বুদ্ধি হলে তাকে কুরআন তথা দীন শিক্ষা দেয়া এবং ৩. বালিগ হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া আরো অনেক শিশু অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। উলেখযোগ্য কতিপয় অধিকার সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

৪.১.১ বেঁচে থাকার অধিকার

শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। কোন অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করা যাবে না। এমনকি চরম দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হলেও না। শিশু হত্যা মহাপাপ, ঘৃণ্য অপরাধ।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমি রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।'[১ক]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন :'যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানকে হত্যা করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।'[২]

কুরআনে আরো বর্ণিত আছে : 'যখন জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।' [৩]

১ক. আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৩১।

২. আল কুর'আন, সূরা আনআম, আয়াত-১৪০।

৩. আল কুর'আন, সূরা তাকভীর, আয়াত ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২ সুন্দর নামের অধিকার

মানুষের জীবনে নামের বিরাট প্রভাব পড়ে। যে ধরনের নামে অন্যেরা হাসাহাসি করে সে ধরনের নাম রাখা উচিত নয়। তাই অর্থ না জেনে নাম রাখা ঠিক নয়। নবজাতকের জন্য একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। যাতে এ নামের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে সন্তানের স্বভাব চরিত্র শুচি শুভ্রতায় ভরে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) বলেছেন: 'প্রত্যেক নবজাতক আকীকার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে প্রাণী যবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুন্ডন করবে।' [৪]

আকীকার মাধ্যমে শিশুর উপর থেকে বালা মুসীবত দূর হয়ে যায়। ছেলে হলে দু'টি এবং মেয়ে হলে একটি কুরবানী যোগ্য পশু দিয়ে আকীকা করা সুন্নত।

৪.১.৩ লালন পালনের অধিকার

সন্তান জন্ম দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সন্তানের লালনপালন পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব। সন্তানের যথাযথ পরিচর্যা করা, উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' [৫]

সন্তান লালনপালন নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন: 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।' [৬]

কাজেই সন্তান লালনপালনে সকলকেই যত্নবান হওয়া উচিত, এটা শিশুর ন্যায্য ও প্রাপ্য অধিকার।

৪.১.৪ শিশুর খাদ্যের অধিকার

শিশুর ভরণ-পোষণ মৌলিক অধিকার। শিশুর জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। মায়ের দুধের বিকল্প নেই। ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধপান করানোর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেছেন: 'মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে।' [৭]

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে মায়ের দুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুর বয়স হওয়া পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয়র যোগান মা-বাবাকেই দিতে হবে। কেননা জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৪. ইমাম আবু ঈসা আত্ তিরমিযী, (অনুবাদঃ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ), *তিরমিযী শরীফ ৪র্থ খন্ড*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২, পৃ. ৪২।

৫. আল্লামা ওলীউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, (অনুবাদঃ মাওলানা এ.বি.এম. এ খালেক মজুমদার), *মিশকাত শরীফ*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ১৭৮।

৬. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৩।

৭. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫ সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকার

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভাল থাকা নির্ভর করে শারীরিক সুস্থতার উপর। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে প্রথম সোপান হল মাতৃদুগ্ধ পান। মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শৈশবকাল। এ সময়ে দেহ ও মনকে যদি রোগমুক্ত রাখা যায় পরিণত বয়সে তার সুফল পাওয়া যায়। এ কারণেই শিশুর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিশুর সুস্থতার উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ। অসুস্থ হবার সাথে সাথেই চিকিৎসা করানো পিতমাতার কর্তব্য। রুগ্ন শিশু মানসিক বিকাশের অন্তরায়। একটি সুস্থ জাতি গঠনে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরী।

৪.১.৬ শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। বাবা মা-ই হলেন তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। জন্মলাভের পর একটি শিশু যে শিক্ষা লাভ করবে, আজীবন তা লালন করবে। কাজেই মা-বাবা হলেন শিক্ষার কারিগর। ইসলামের প্রত্যেক নর-নারীর জ্ঞান অর্জন করা ফরয। পিতামাতার প্রতি এটা সন্তানের হক।

নবী করীম (সাঃ) আর ও বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের শিক্ষা দাও। কারণ তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে, যা তোমাদের যুগ নয়।' [৮]

শিশুর মায়ের কোল থেকেই শিক্ষার শুরু। কথা বলার সাথে সাথে তাকে কালেমা, আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম শিক্ষা দেয়া উচিত। নৈতিক চরিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আদর্শবান নাগরিকের জন্য আদর্শ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

---

৮. আল্লামা ওলীউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, (অনুবাদঃ মাওলানা এ.বি.এম. এ খালেক মজুমদার), *মিশকাত শরীফ ৩য় খন্ড*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৭ বিনোদনের অধিকার

শিশুর মানসিক বিকাশ ও শারিরীক সুস্থতার জন্য বিনোদনের বিকল্প নেই। খেলাধুলা শরীর চর্চা শরীরকে সুস্থ রাখে। বিনোদন এনে দেয় প্রাঞ্জল হাসি, সুখ ও আনন্দ। মানসিক প্রশান্তি অন্তরের উপলব্ধি খুলে দিতে সাহায্য করে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং কুস্তি লড়েছেন। ঘোড়া দৌড়িয়েছেন, তীর চালনা করছেন। কাজেই বিনোদনের মাধ্যমে শিশুর চিত্ত প্রফুল্ল ও বিকশিত হয়।

৪.১.৮ চরিত্র গঠনের অধিকার

চরিত্র মানুষের মূল্যবান সম্পদ। যার চরিত্র নেই তার কোন কিছু নেই। নৈতিক চরিত্র মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। চরিত্রবান ও চরিত্রহীনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। শিশুরা আগামীদিনের কর্ণধার। আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশ বিনির্মাণে শিশুদের হতে হবে উন্নত চরিত্র ও অনুপম আদর্শের অধিকারী। কেননা শিশুর মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত না হলে সুশীল সমাজ বিনির্মাণ অসম্ভব। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা অনেক বেশি।

কুর'আন ও হাদীসে নৈতিক চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন: 'পিতামাতা সন্তানকে ভাল আদব-কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন দান দিতে পারে না।' [৯]

সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়। তাই শিশুদের মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি পিতামাতার দায়িত্ব। তাদেরকে নামায রোযায় অভ্যস্ত করা সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব পিতামাতার উপর। সন্তান যাতে মন্দ সাহচর্য ও নেশার ধারে কাছে না যেতে পারে সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। খেলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব হতে হবে আদর্শবান। কথায় আছে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

---

৯. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৯ শিশুর নিরাপত্তা বিধানের অধিকার

শিশুদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোন বাধাই শিশুর সুকুমার প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখতে পারে না। খোলামেলা তাদের সবকিছু। এই নিষ্পাপ শিশুরা আজো অপহরণ ধর্ষণের শিকার। যে শিশুর হাতে থাকার কথা বই খাতা কলম সেই কোমল হাতে হাতুড়ি পিটিয়ে ভাংছে কঠিন ইট পার। অনেক ক্ষেত্রে বাবা মার অবহেলারও শিকার হচ্ছে। যুদ্ধেও শিশুরা ব্যবহৃত হচ্ছে, মরছে। যুদ্ধ বা শান্তি উভয় প্রেক্ষাপটে ইসলাম শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

যুদ্ধের বিভীষিকা মুহূর্তেও মহানবী (সাঃ) শিশু হত্যা নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করছে 'যারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে, অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' [১০]

৪.১.১০ সুন্দর জীবন গঠনের অধিকার

প্রত্যেক শিশুরই একট সুন্দর জীবন আছে। আছে সুন্দর ভবিষ্যৎ। শিশুর লালিত সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেয়া অভিভাকের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ শিশুরা আগামী প্রজন্মের কান্ডারী। বড় হয়ে তারা বিভিন্ন পেশার নানা শাখা- প্রশাখায় বিস্তার লাভ করবে। দেশ ও জাতি হবে উপকৃত। খ্যাতি কুড়িয়ে আনবে পিতা মাতা, দেশ ও জাতির। কাজেই শিশুর সুন্দর জীবন গঠনে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

শিশুরা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত পবিত্র আমানত, নতুন প্রজন্মের হাতিয়ার, বংশের বাতি। এ বাতির আলো রাখতে হবে সমুজ্জ্বল। সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সকলের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কেননা শৈশবই হচ্ছে মানব জীবনের ভিত্তিভূমি। এ সময়ে অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শৈশবে সুকুমার প্রবৃত্তি থাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয়। শৈশবের শিক্ষাই তার সারা জীবনের পাথেয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন: 'সন্তানকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এক সাগর পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সাদকা করার চেয়ে উত্তম।' [১১]

---

১০. আল কুর'আন, সূরা আনআম, আয়াত-১৪০।

১১. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১১ শিশুর মতামত প্রকাশের অধিকার

প্রত্যেক শিশুর সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো সবল। তার সুপ্ত ইচ্ছে গুলো প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। সে কি বলতে বা করতে চায়, তা প্রকাশে বাধা দেয়া সঙ্গত হবে না। তাতে তার কোমল মনে আঘাতে পাবে। অবশ্য তার মতামত কতটা গুরুত্ব পাবে তা নির্ভর করবে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার উপর। ঘরে এবং স্কুলে প্রতিদিন যেসব ইচ্ছে মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে তা প্রকাশের স্বাধীনতা শিশুর একান্ত নিজস্ব। যে কোন মতামতই অংকুরে অবদমিত করা শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

সন্তান হল হৃদয় জুড়ানো নয়ন প্রীতিকর। আগামী দিনের সকল আশা ভরসা। মহৎ জীবনের খোঁজে তাদের এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে। মহানবী (সাঃ) শিশুদের গভীর স্নেহ মমতা দিয়ে ভালবাসতেন। শিশুদের প্রতি দয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল্লাহ্ (সাঃ)। একটি সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানসিক বিকাশ অপরিহার্য। নিম্নবর্ণিত পন্থাসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষাদানে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

(ক) বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মতামত ব্যক্ত করতে তাকে অভ্যস্ত করানো এবং সমস্যা সম্পর্কে তার মধ্যে চেতনা সৃষ্টিকরা ও তাতে নিজের প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি দান।

(খ) তার মতামতে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকলে তা দেখিয়ে দিয়ে সুন্দর মতামত দান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে সাহায্য করা।

(গ) বড়দের মন্তব্য প্রকাশ ও তাদের মন্তব্য ও মতামতের ভাল দিকগুলো দেখিয়ে দেয়া, যাতে করে শিশুর অন্তরে ও সঠিক মতামত পেশ ও সিদ্বান্ত গ্রহণের শক্তি সৃষ্টিতে চিন্তা করার অবকাশ জন্মে।

(ঘ) সমস্যাদি সম্পর্কে শান্ত পর্যালোচনায় অভ্যস্ত করানো, যাতে করে কোন সমস্যা দৃষ্টে সে অক্ষমের মত দাঁড়িয়ে না থাকে, বরং এর সমাধানে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় মনোবল। বিভিন্ন মতামত, সিদ্ধান্তের ভাল ও মন্দ উভয় দিক নিয়ে তার সাথে আলোচনা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) এভাবে শিশুদেরকে ভবিষ্যতের জন্য এবং আগামী দিনে যে সমস্ত সমস্যাদির সম্মুখীন হবে তার সুন্দর মুকাবিলার জন্য তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা যায়।

(চ) তাকে একজন সাধারণ মূল্যহীন মন্তব্যকারী হওয়ার মনোভাব পোষণ থেকে দূরে রাখা আর তাকে বিভিন্ন সমস্যাদির মুকাবিলায় অভ্যস্ত করানো দরকার যাতে করে কোন সমস্যাদৃষ্টে যে ভীত সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে পড়ে।

মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আকাঙ্খিত সতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ নীতি যার আলোকে সাহাবাগন তাঁদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশে অভ্যস্ত করেছিলেন, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এবং ঘটনা। একবার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ মুমিনকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন- যার পাতা ঝরেনা, তোমাদের, জানা আছে কি, তা কোন বৃক্ষ' ? সাহাবীরা সবাই চুপ রইলেন। তখন রাসূল (সাঃ) নিজেই উত্তর দিলেনঃ 'তা হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর তাঁর পিতার সাথে এখানে উপস্থিত ছিলেন। পিতা-পুত্র দুজনেই যখন বাড়ি ফিরে গেলেন, তখন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতাকে বললেনঃ রাসূল (সাঃ) যা বলেছিলেন তা আমার জানা ছিল কিন্তু আমি সাহাবীদের সম্মুখে উত্তর দিতে ভয় করেছিলাম। তখন তাঁর পিতা তাকে বললেনঃ 'তুমি যদি তখন এ কথাটি বলে দিতে, তবে তা বহু সংখ্যক লাল রংয়ের পশুর সঠিক হওয়ার চাইতেও আমার নিকট অধিকতর আনন্দের বিষয় হতো।' [১২]

১২. মওলানা এ.বি. রফিক আহমেদ ও মওলানা মুহাম্মদ মুসা, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ

৪.২.১ নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন

স্বাধিকার কথাটির অর্থ হলো স্ব অধিকার বা নিজ অধিকার। ইসলাম মহিলাদের জন্য যে সকল অধিকার নির্ধারিত করেছে তাই হচ্ছে তাদের স্বাধিকার। কুরআন মজীদে নারীদের যে অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে কেবল তাই আলোচনা করা হবে।

নারীর বেঁচে থাকার অধিকার

জাহিলী যুগে আরব সমাজে নারীদের কোন ব্যাপারেই অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। এমন কি সে সমাজে কন্যা সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিল না। পিতা কন্যাকে দারিদ্র্য ও অপমানের কারণ বলে মনে করত। তাই অনেক পিতা আপন ঔরসজাত কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিয়ে দারিদ্র্য ও অপমানের গ্লানি হতে অব্যাহতি লাভ করত। আর কেউ কেউ কন্যাকে জ্যান্ত কবর না দিলেও অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং অপমানের সাথে তাকে কোন রকমে শুধু বেঁচে থাকতে দিত। তাদের নিকট কন্যা-সন্তানের কোন মর্যাদাই ছিল না। তারা সর্বদা পুত্রসন্তান লাভের আশা করত। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হেয় মনে করত। তাদের মন মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ-

'তারা বলত, কন্যা সন্তানরা তো আল্লাহর। অথচ মহান আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করা হতে চির পবিত্র। আর তারা নিজেদের জন্য কামনা করত শুধু পুত্র সন্তান।' [১৩]

কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অপমানিত বোধ করত। তাদের এই অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ-يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَابُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হত তখন তার চেহারা হয়ে যেত কাল ও মলিন। মনোকষ্টে তার হৃদয় হত ভারাক্রান্ত। এই দুঃসংবাদের কারণে তার মাথা

---

১৩. আল কুর'আন, সূরা নাহল, আয়াত-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

নীচু হয়ে যেত এবং সে নিজেকে লোকচক্ষু হতে আড়াল করে চলতে থাকত। আর মনে মনে ভাবত যে, আপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে জীবিত রাখবে, না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। কতই না জঘন্য তাদের বিচার-বিবেচনা।' [১৪]

আরব সমাজে এই নিষ্ঠুর প্রথাটি প্রথমে গোত্রনেতা, ধর্মগুরু এবং গণকদের থেকে আরম্ভ হয়। তারা নিজেরাই শুধু এই জঘন্য কর্মে লিপ্ত হত না, বরং জনসাধারণকেও এ কাজ করার জন্য পরামর্শ দিত। তারা বলত যে, মেয়েরা তো অপমানের কারণ। সুতরাং তোমরা তাদের জীবিত রেখ না। এদের প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ۔

'বহুসংখ্যক মুশরিকদের নিকট তাদের প্রভুরা সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে তুলে ধরেছিল। যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।' [১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ

يقول تعالى كما زينت الشياطين لهؤلاء ان يجعلوا لله مما ذوا من الحرث والانعام نصيبا كذالك زينوالهم قتل اولادهم خشية املاق ووأد البنات خشية العار۔

'মহান আল্লাহ্ বলেন, শয়তানেরা তাদের ঐ সকল অনুসারীদের যেভাবে বুঝয়েছিল যে, আল্লাহ্ যে শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এর এক অংশ আল্লাহ্র আর এক অংশ আমাদের অংশীদারদের; ঠিক সেভাবেই তারা তাদের অনুসারীদের এ কথাও বুঝিয়েছিল যে সন্তানাদি দারিদ্র্যের কারণ আর কন্যা সন্তান হচ্ছে অপমানের কারণ। আর এভাবেই তারা অনুসারীদের কাছে সন্তান হত্যা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়াকে শোভনীয় কাজ বলে তুলে ধরেছিল।'[১৬]

---

১৪. আল কুর'আন, সূরা নাহল, আয়াত-৫৮-৫৯।

১৫. আল কুর'আন, সূরা আনআম, আয়াত-১৩৭।

১৬. ইমাম আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর (অনুবাদঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক), *তাফসীরুল কুরআনিল-আযীম-তাফসীরে ইব্নে কাসীর*, ৪র্থ খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ.৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীত্বের প্রতি এই অমানবিক আচরণ চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে।

প্রথমত পিতাদেরকে তাদের এই নিষ্ঠুর কাজের পরিণতির কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে কালামে পাকে ইরশাদ হলঃ

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ – بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

'কিয়ামতের দিন জীবিত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে সে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' [১৭]

তখন এই ঘাতক পিতাদের কি অবস্থা হবে? এই ঘোষণার সাথে সাথে সমাজপতি এবং সাধারণ লোকদের দিল-দেমাগের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

তাফসীরুল জালালাইনে الموءدة শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছেঃ

الموءدة الجارية تدفن حية خوف العار والحاجة–

الموءدة হলো এই কন্যাসন্তান যাকে অপমান ও অভাবের আশংকায় জীবিতই কবর দেয়া হয়। [১৮]

কন্যা-সন্তান হত্যা করা যে তাদের জীবনে এক বিরাট ক্ষতি বয়ে আনবে এ কথা জনিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে ঘোষণা করলেনঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ–

'যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার দরুন আপন সন্তানদেরকে হত্যা করে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' [১৯]

এরপরই মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করলেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ–

'তোমরা দারিদ্র্যের কারণে সন্তানদের হত্যা কর না। তোমাদের এবং তাদের রিযিক আমিই দিয়ে থাকি।' [২০]

---

১৭. আল কুর'আন, সূরা তাকবীর, আয়াত-৮-৯।

১৮. জালালুদ্দীন সয়ূতী ও জালালুদ্দীন মাহাল্লী, তাফসীরুল, জালালাইন, দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, (তা.বি.), পৃ ৪৯১।

১৯. আল কুর'আন, সূরা আনআম, আয়াত-১৪০।

২০ আল কুর'আন, সূরা আনআম, আয়াত-১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের সম্পদের উপর অধিকার

জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েরা যদি নিজেরাই কোন উপায়ে কিছু সম্পদ উপর্জন করত অথবা কারো নিকট হতে হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসেবে কোন কিছু পেত তাতে তাদের কোন অধিকার ছিলনা। এ থেকে ইচ্ছামত কোন কিছুই তারা খরচ করতে পারত না তাদের পুরুষ অভিভাবকেরাই এ সম্পদের মালিক হয়ে বসত এবং তাদের খুশীমত তারা তা ব্যয় করত। কিন্তু ইসলাম মেয়েদের তাদের উপার্জিত বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত ধন সম্পদের উপর পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

'পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর মহিলারা যা উপার্জন করে তাতে ও রয়েছে তাদের পূর্ণ অধিকার।' [২১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী (র) বলেনঃ

جعل ما قسم اكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط او القبض كسبا له–

'মহান আল্লাহ্ নর ও নারী প্রত্যেকের অবস্থা অবগত আছেন। ভিন্ন অবস্থার দরুণ তাদের প্রয়োজনও কম-বেশি হয়ে থাকে। এ তারতম্য বিবেচনায় রেখেই আল্লাহ পাক তাদের সম্পদ নির্ধারণ করেছেন। আর নির্ধারিত সম্পদই তাদের উপজীবিকা হিসেবে বিবেচিত।' [২২]

অতএব, ইসলাম শরীয়াতে নারীদের নিজেদের অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। এতে তাদের কোন অভিভাবক বা অপর কারুর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

---

২১. আল কুর'আন, সুরা নিসা, আয়াত-৩২।

২২. আল্লামা আবুল কাসেম জারুল্লাহ্ যামাখশারী, *তাফসীরে আল কাশ্‌শাফ*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাত, (তা.বি.), পৃ. ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মীরাসের অধিকার

প্রাক-ইসলামী যুগে মৃত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলাম পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের অধিকারও নির্ধারিত করে ছিয়েছে। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ـ

'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত প্রত্যেক সম্পদের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি।' [২৩]

শাইখ তানতাবী জওহারী এ আয়াতের শাব্দিক ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

(ولكل) من الرجال والنساء (جعلنا موالى) ورثة من بنى عم او اخوةاو غير هم يرثون (مما ترك الوالدان والاقربون) اى من يراثهم-

'(প্রত্যেক) পুরুষ এবং মহিলার জন্য (আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করেছি) তারা চাচার সন্তান, অথবা ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গ। (পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায়) তারা তাদের পরিত্যক্ত সেসব সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।' [২৪]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ ও মাহিলা উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে বর্ননা দিয়ে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا-

'পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষদের অংশ আছে। আর পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সম্পদে মহিলাদেরও অংশ আছে। সে সম্পদ পরিমাণে অল্পই হোক আর বেশিই হোক। আর এ অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত।' [২৫]

---

২৩. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-৩৩।

২৪. শাইখ তানতাবী জওহারী, *তাফসীরুল জাওয়াহের*, ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়াউত্ তুরাসিল আরবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ৩৮।

২৫. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী (র) বলেনঃ

یہاں صرف اس قدر فرمایا کہ میت خواہ والدین ہوں خواہ اقارب ہوں ان کی مال میں جس طرح مردوں کو حصہ پہنچتا ہی اسی طرح عورتوں کو بھی — خواہ وہ چیز کم ہو یا زیادہ —

'এখানে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা হোক অথবা অন্য কোন আত্মীয় হোক, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন অংশ আছে, ঠিক তেমনি মহিলাদেরও অংশ রয়েছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ কমই হোক আর বেশিই হোক।' [২৬]

ইসলামী শরীয়াত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে মহিলাদের প্রাপ্য অংশ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ নির্ধারিত অংশ পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।

কন্যা হিসেবে

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের পুত্র এবং কন্যা সন্তান জীবিত থাকলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে। আর যদি পুত্র না থাকে এবং মাত্র একজন কন্যা থাকে, তাহলে সে একাকী সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে। আর যদি পুত্র সন্তান না থাকে এবং কেবল দুইজন বা ততোধিক কন্যা থাকে, তাহলে কন্যারা সকলে মিলে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

এ প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ —

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছেন। এক পুত্র পাবে দুই কন্যার সমান। আর যদি শুধু কন্যাই দুইজন বা দুই এর বেশি হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।আর শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।' [২৭]

---

২৬. মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী, *তাফসীরে হাক্কানী*, *২য় খন্ড*, নয়া দিল্লীঃ ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, (তা.বি.), পৃ. ১২৯।

২৭. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১১।

Dhaka University Institutional Repository

للذكر مثل حظ الانثيين -এর ব্যাখ্যায় শাইখ আহমদ জৌনপুরী বলেনঃ

يعنى حصة الذكر الواحد والانثيين من البنات سواء ــ وانما لم يقل للانثيين مثل حظ الذكر او للانثى نصف حظ الذكر مع انهما يؤديان مؤدى الاولى للتنبيه على فضل الذكر ــ

অর্থাৎ, এক ছেলের এবং দুই মেয়ের অংশ সমান। কিন্তু এ কথা বলা হয় নি যে, দুই মেয়ের অংশ এক ছেলের অংশের সমান অথবা এ কথাও বলা হয়নি যে, এক মেয়ে পাবে এক ছেলের অংশের অর্ধেক। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত দু'টি উক্তি যদিও প্রথামোক্ত উক্তিটির সমার্থক। এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের প্রাধান্য বর্ণনা করা। [২৮]

স্ত্রী হিসেবে

মৃত স্বামীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর মৃত স্বামীর যদি পুত্র কন্যা অথবা নাতি-নাতনী থাকে, তাহলে স্ত্রী পাবে এক-অষ্টমাংশ। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ــ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ــ

'যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমাদের কোন সন্তান থাকলে স্ত্রীরা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ।' [২৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগাবী (র) বলেনঃ

هذا ميراث الذوجات واذا كان للرجل اربع نسوة فهن يشتركن فى الربع والثمن-

---

২৮. শাইখ আহমাদ জৌনপুরী, *আত্ তাফসীরুল আহমাদিয়া*, পেশওয়ারঃ মাকতাবা-ই-হাক্কনিয়া, (তা. বি.), পৃ. ২২৯।

২৯. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১২।

Dhaka University Institutional Repository

'এ হচ্ছে স্ত্রীরে জন্য নির্ধারিত অংশ। মৃত ব্যক্তির যদি চারজন স্ত্রী থাকে, আর তার যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ চার স্ত্রীর মধ্যে সমান চার ভাগে বন্টিত হবে। আর মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে, তার সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ চার স্ত্রীর মধ্যে সমান চার ভাগে বন্টিত হবে।' [৩০]

মা হিসেবে

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার মা পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তার মা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তির সহোদয়, বৈমাত্রের অথবা বৈপিত্রেয় যে কোন প্রকারের একাধিক ভাই থাকলে তার মা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। এই মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ـــ

'মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান থাকে, তাহলে পিতা-মাতার প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার উত্তরধিকারী হয়, তাহলে তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। আর মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকলে তার মা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।' [৩১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেনঃ

'In this case the parents first take their respective shares, and the residue goes to the children, if there are any, failing which the share of the parents increased. But in the case the deceased has brothers the mother recieves the same share as she would have recived if the deceased has children.'

---

৩০. ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল ফারা আল বাগাবী, *মু'আলিমুত তানযিল*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ মাকতাবাতুল ইল্‌ম. (তা. বি.), পৃ. ৪০৩।

৩১. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত- ১১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে প্রথমে পিতা-মাতা তাদের অংশ গ্রহণ করে। আর মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বাকী অংশ তারাই পায়। সুতরাং সন্তান না থাকলে পিতা-মাতার অংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ভাই থাকলে মাতা ঠিক সেই অংশই পাবে যা মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পেত। [৩২]

বোন হিসেবে

কোন ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন এবং পুত্রকন্যাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'কালালা' [৩৩] বলা হয়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে, তাহলে সে পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বা ততোধিক বোন থাকলে, তারা সকলে মিলে পাবে মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি বোনের সাথে ভাই ও জীবিত থাকে, তাহলে প্রত্যেক বোন ভাইয়ের অর্ধাংশ পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

'(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, আর তার মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বোন থাকলে তারা মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই ও বোন এক সাথেই জীবিত থাকে, তাহলে একজন ভাই দুইজন বোনের সমান অংশ পাবে।' [৩৪]

---

৩২. Maulana Muhammad Ali, *The Holy Quran*, United States: American Trust Publications, (Op. Cit.), P. 202.

৩৩. উল্লেখিত আয়াতের كَلٰلَة শব্দের ব্যাখ্যায় মাওলানা আলী হাসান বলেন, 'কালালা' শব্দের অর্থ পিতা-পুত্রহীন অর্থাৎ যার পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কেউই বিদ্যমান না থাকে, তাকেই 'কালালা' বলে। আবার যে সকল উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা আথবা পুত্র-কন্যার বংশধর নয়, তারাও 'কালালা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

দ্রষ্টব্যঃ মাওলানা মুহাম্মদ আলী হাসান, কুরআন শরীফ-তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ উসমানিয়া বুক ডিপো, (তা.বি.), পৃ. ৩৩৪।

৩৪. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

মহরের অধিকার

শরীয়তের বিধান অনুসারে বিয়ের সময় স্বামী নগদ যে সম্পদ প্রদান করে অথবা পরে তা পরিশোধ করার অঙ্গিকার করে, তাকে মহর বলে। মহর আল্লাহর তরফ হতে নির্ধারিত স্ত্রীর জন্য একটি বিশেষ সম্মানী উপঢৌকন। মহর প্রদান স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। এটা স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য একটি বিশেষ অধিকার।

জাহিলী যুগে আরব সমাজে মহরের কোন গুরুত্ব ছিল না। অনেক সময় মহর ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে দেয়া হত। আর মহরের উপর মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। মহর হিসেবে যা কিছু আদায় হত, তা মেয়েদের অভিভাবকরাই লুটপাট করে খেত। বিবাহোত্তরকালে অনেক সময় স্বামীও এ সম্পদ আত্মসাৎ করত। কিন্তু ইসলাম নারীকে মহরের উপর নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছে। সে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে মহর হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করতে পারে। এতে অভিভাবক, স্বামী বা অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

জাহিলিয়াতের যুগে পুরুষের জন্য স্ত্রী গ্রহণ এবং স্ত্রী বর্জন একটা মামূলী ব্যাপার ছিল। তারা খেয়াল-খুশীমত যখন ইচ্ছা তখন কোন মেয়েকে বিয়ে করত, আবার যখন ইচ্ছা তখন তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিত। এজন্য পুরুষদের আর্থিক কোন দণ্ড দেয়ার বিধান ছিল না।

নারীদের প্রতি পুরুষদের এই অমানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে, নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে ইসলামী শরীয়ত মহরকে একটি বাধ্যতামূলক অনুদানরূপে নির্ধারিত করেছে। সুতরাং বিয়ের সময় স্ত্রীকে মহর প্রদান স্বামীর জন্য অপরিহার্য।

মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً —

'তোমরা খুশি মনে নারীদেরকে মহর প্রদান কর।' [৩৫]

---

৩৫. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত- ৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী (র) বলেনঃ

هذه الاية تدل علي وجوب الصداق للمرأة - وهو مجمع عليه لاخلاف فيه-

এ আয়াতের দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীকে মহর প্রদান করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীগণ একমত পোষণ করেন। এতে কোন বিরোধ নেই। [৩৬]

নর-নারীর জীবন সুখময় এবং শান্তিময় করার উদ্দেশ্যেই উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً-

'তোমরা জীবনে আরাম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মহর দিয়ে দাও। আর জেনে রেখ যে, এটা একটা ফরয-কর্তব্য।' [৩৭]

জাহিলী যুগে ক্রীতদাসীদের মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হত। তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। তাদেরকে মুক্ত করে বৈবাহিক মর্যাদা দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করলেনঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

'তোমরা দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে কর এবং শরীয়তের প্রচলিত বিধি মোতাবেক তাদের মহর প্রদান কর।' [৩৮]

বিয়ের সময় মহরের যে চুক্তি করা হয় তা পূর্ণ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। এটা তার উপর এমনই এক দায়িত্ব যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। অতএব, এ বিষয়ে খুব চিন্তা-ভাবনা করে আর্থিক অবস্থা এবং সামর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বামী মহর ধার্য করবে। কারণ এ বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। অতএব, শরীয়ত কারো জন্য মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে নি। প্রত্যেক স্বামী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মহর ধার্য করবে। বিত্তবান কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় স্ত্রীকে মহর হিসেবে মোট সম্পদও প্রদান করতে পারে। তবে ধার্যকৃত মহরের অংশ বিশেষ সে ফেরত নিতে পারবে না।

---

৩৬. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল কুরতুবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১৭।

৩৭. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-২৪।

৩৮. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا۔

'তোমরা কোন স্ত্রীকে-রাশি সম্পদও দিতে পার। কিন্তু তা থেকে কিছুই ফেরত নিবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ফেরত নিতে চাও? এরূপ করলে তোমরা সুস্পষ্ট গুনাহগার হবে।' [৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (র) বলেনঃ

اور ان میر سی ایك بیوی کو مال کا ایك خزانه بهی دیچکی هو تو تم اس دئی هوئی مال میں سی کوئی چیز واپس نهلو۔ کیا تم اس دئی هوئی مال تهمت لکا کر اور صریح کناه کی ذریعه واپس لینا چاهتی هو یعنی اکر تمبلا وجه اور بقصور بیوی سی مهر واپس لوکی تویه ناحق ــ

'আর তোমরা যদি কোন স্ত্রীকে এক ভান্ডার পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাক, তোমরা ঐ দেয়া সম্পদ হতে সাম্যন্য পরিমাণও ফেরত নিও না। তোমরা কি ঐ দেয়া সম্পদ কোন দোষ দিয়ে এবং অন্যায়ভাবে ফেরত নিতে চাও। অর্থৎ তেমরা যদি বিনা কারণে এবং বিনা দোষে স্ত্রীর নিকট হতে মহর ফেরত নাও তবে তা ঠিক হবে না।' [৪০]

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আর ও বলেছেনঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا۔

'তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।' [৪১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (র) বলেনঃ

ان من الاحسان ان لا یأخذ الزوج من امرأته شیأ واستثنی من هذه الحالة قصة الخلع ــ فاباح للرجال ان یأخذ منها۔

---

৩৯. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-২০।

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, ২য় খন্ড, লাহোরঃ মাকতাবাতু উসমানিয়া, ১৯৮২, পৃ. ৪০।

৪১. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

'উত্তম নীতি এই যে, স্বামী স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছে তা থেকে কিছু ফেরত নেবে না। তবে খুল'আর ব্যাপারটা এর ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর নিকট হতে কিছু ফেরত নিতে পারে।' [৪২]

তবে মহর ধার্য করে বিয়ে করার পর এবং তা আদায়ের পূর্বে স্বামীর আর্থিক অবস্থা যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি সদয় আচরণ প্রদর্শন করতে পারে। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয় অথবা তার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট মনে মহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় অথবা তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে খুশির সাথে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তা খুবই ভাল কথা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ঘোষণা করেনঃ

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

'স্ত্রীরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে মহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা তা খুশি মনে ভোগ করতে পারে।' [৪৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেনঃ

يعنى الزوجات ان طبن نفسا عن شيى من صداقهن لازواجهن ـ

'স্ত্রীরা যদি খুশি মনে তাদের মহরের কিছু অংশ তাদের স্বামীদেরকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা তা বিনা দ্বিধায় ভোগ করতে পারে।' [৪৪]

এরপর আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ـ

'মহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রীরা পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশি করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই।' [৪৫]

---

৪২. আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আবূ হাইয়্যান আল আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত ফিত্ তাফসীর*, ২য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, (তা.বি.), পৃ. ৪৬৯।

৪৩. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-৪।

৪৪. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল মাওয়ারদী, *আন্ নুকাত ওয়াল উয়ুন্-তাফসীরুল মাওয়ারদী*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, (তা.বি.), পৃ. ৪৫১।

৪৫. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের অধিকার

খোরাক, পোশাক ও বাসস্থান নর-নারী নির্বিশেষ সব মানুষেরই মৌলিক অধিকার। নারীর এ অধিকার পূরণের দায়িত্ব তার অভিভাবক পুরুষের উপর অর্পিত। নারী জীবনের তিনটি স্তরেই পুরুষ অভিভাবক তার এ অধিকার পূরণ করে থাকে। বিবাহের পূর্বে নারীর খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করে তার পিতা। বিবাহের পর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর উপর। আর স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর এ তিনটি মৌলিক অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার ছেলেদের উপর।

বাবার সাথে মেয়ের সম্পর্ক এবং মা-এর সাথে ছেলের সম্পর্ক বড়ই গভীর, বড়ই নিবিড়। এ সম্পর্ক রক্তের, জন্মগত কারণেই বাবার হৃদয় মেয়ের জন্য দরদে ভরা। আর ছেলের হৃদয় মায়ের জন্য মমতায় পরিপূর্ণ। কাজেই স্বভাবজাত কারণেই বাবা ভরণ-পোষণ করে মেয়ের আর ছেলে সেবা-যত্ন করে মায়ের। তদুপরি ইসলাম বাবা ও ছেলেকে ও গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। বাবার দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ــ

'সন্তানের পিতার দায়িত্ব হল স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের সুব্যবস্থা করা।'[৪৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ আলী আস্সাবূনী (র) বলেনঃ

اى على الاب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بما هو متعارف بدون اسراف ولاتقتير لتقوم بخدمته حق القيام ــ

'তালাকপ্রাপ্তা জননীদের খোরাক ও পোশাকের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর অর্পিত। এ ব্যাপারে অমিতব্যয়ী হবে না, আবার কৃপণতাও করবে না। বরং ন্যায়-নীতি অনুসারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। যেন সে মহিলা সুস্থ ও সবল হয়ে যথাযথভাবে সন্তানের সেবা-যত্ন করতে সক্ষম হয়।'[৪৭]

---

৪৬. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৩।

৪৭. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনী, *সাফওয়াতুত্ তাফসীর*, ১ম খন্ড, তেহরানঃ দারুল ইহসান, (তা.বি.), পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভিন্ন ধরনের। স্বামী এক পরিবারের ছেলে আর স্ত্রী অপর আর একটি পরিবারের মেয়ে। ভিন্ন পরিবারের দুইটি প্রাণী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার গড়ে। মহান আল্লাহ্ উভয়ের হৃদয়েই পরস্পরের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করেন। তাই তাদের পক্ষে সারাটি জীবন এক সাথে অতিবাহিত করা সম্ভব হয়। ইসলাম স্ত্রীর মৌলিক অধিকার তথা, পোশাক ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করেছে। স্বামীকে এ কঠিন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ـــ

'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।' [৪৮]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ـــ

'তোমরা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের উপঢৌকন প্রদান কর। এ ব্যাপারে ধনী ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দারিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদানের যথাসম্ভব উত্তম ব্যবস্থা করবে। এটা সৎকর্মীদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।' [৪৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আবদুল আযীয (র) বলেনঃ

'সামান্য পরিমাণ অর্থ বা বস্তু দেওয়াকে মুত'আ বলা হয়, যাকে উপঢৌকনও বলা যেতে পারে। মুত'আর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকলেও তা স্বামীর অবস্থানুপাতে হতে হবে। অবস্থাপন্ন স্বামীর অবস্থানুপাতে মূল্যবান মুত'আ দিবে। আর স্বামী গরীব হলে তার অবস্থানুপাতে মুত'আ হবে। এটা ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। মুত'আ দেওয়া বাধ্যতামূলক।' [৫০]

---

৪৮. আল কুর'আন, সূরা তালাক, আয়াত-৭।

৪৯. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৬।

৫০.মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, *তাফসীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭, পৃ. ২৫০-২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আর স্ত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ــ

'তোমরা সামর্থ্যনুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস করো, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যও তদ্রুপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন কর না।' [৫১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেনঃ

(واسكنو هن) انزلوهن يعنى المطلقات يقول للازواج (من حيث سكنتم) من اين سكنتم (من وجدكم) من سعتكم على قدر ذلك من النفقة والسكنى (ولاتضاروهن) يعنى المطلقات فى النفقة والسكنى (لتضيقوا عليهن) بالنفقة والسكنى فتظلموهن بذلك ــ

'তোমরা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের বসবাসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দাও। তোমরা যেরূপ স্থানে বসবাস কর তাদেরকেও তদ্রূপ স্থানে বসবাস করার ব্যবস্থা কর। তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে তাদের খাওয়া-পরা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। খোরাক-পোশাক এবং বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের কষ্ট দিবে না। এ ব্যাপারে তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করবে না।' [৫২]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর উপর তার সাধ্যাতীত কোন চাপ প্রয়োগ করবে না। আবার স্বামীও তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করে স্ত্রীকে কোন প্রকারেই কষ্ট দিবে না। তার সাধ্যানুযায়ী উত্তম ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর এ মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার ছেলেদের উপর। মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদে মায়ের প্রতি ছেলেদের কর্তব্য সম্পর্কে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ ــ

---

৫১. আল কুর'আন, সূরা তালাক, আয়াত-৬।

৫২. হযরত ইব্নে আব্বাস (রা), *তানবীরুল মিকরাস মিন তাফসীরে ইব্নে আব্বাস*, করাচীঃ খাদীমী কুতুবখানা, (তা.বি.), পৃ. ৬০২।

Dhaka University Institutional Repository

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করে থাকেন।' [৫৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইউসুফ আলী (র) বলেনঃ

The set of milk teeth in a human child is completed at the age of two years, which is therefore the natural extreme limit for breast-feeding. In our artficial life the duration is much less.

অথাৎ মানব শিশুর দুধ-দাঁত উঠা শেষ হয় দুই বছর বয়সে। অতএব এটাই হচ্ছে মাতৃস্তন পানের প্রাকৃতিক শেষ সময়সীমা। কিন্তু আমাদের কৃত্রিম জীবন ব্যবস্থায় এর সময়সীমা আরও অনেক কম। [৫৪]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا-

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার, বিশেষ করে মায়ের সাথে। কেননা মা তাকে খুব কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করে থাকেন। আর তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং স্তন্য দান করতে সময় লাগে কমপক্ষে ত্রিশ মাস।' [৫৫]

দাম্পত্য অধিকার

জাহিলী যুগে দাম্পত্য জীবনে নারীর কোন অধিকার ছিল না। দাম্পত্য অধিকার বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবটুকু ছিল স্বামীর করায়ত্ত্ব । নারীর সব কিছুই ছিল পুরুষের জন্য নিবেদিত। পুরুষের উপর তার কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর সমঅধিকার ঘোষিত হল।

---

৫৩. আল কুর'আন, সূরা লুকমান, আয়াত-১৪।

৫৪. Allama Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran*, U.S.A Amana Corp. 1983. P. 1083.

৫৫. আল কুর'আন, সূরা আহকাফ, আয়াত-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ-

'স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যে রকম অধিকার আছে, স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে।' [৫৬]

আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ-

'(হে স্বামীরা জেনে রাখ যে,) স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ।' [৫৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুস সউদ (র) বলেনঃ

جعل كل من الرجل والمرأة لباس للاخر لاعتناقهما واشتمال كل منهما على الاخر بالليل او لان كلا منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور-

'স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই একে অপরের জন্য পোশাক বলে গণ্য করা হয়েছে। রাতে উভয়ের নিকটতম অবস্থান এবং নিবিড় সম্পর্কের জন্য এরূপ মনে করা হয়। অথবা এরূপ মনে করার কারণ এই যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একে অপরের অবস্থা গোপন রাখে এবং পরস্পরকে পাপাচার হতে বিরত রাখে।' [৫৮]

এই সংক্ষিপ্ত আয়াত দু'টিতে দাম্পত্য জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও পদ্ধতি বর্নিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপারে ও বিষয়েই নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মানবীয় সকল অধিকারেই নারী ও পুরুষ সমান। প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং তা সমান সমান। পোশাক নারীদের জন্য যেরূপ প্রয়োজন, পুরুষদের জন্য ও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। পোশাকের প্রয়োজনীয়তা কারও জন্য এতটুকুও কম বেশি নয়। একেবারেই সমান সমান। আর পুরুষদের সেই পোশাক হল নারীরা আর নারীদের পোশাক হল পুরুষেরা। দুনিয়ার ব্যবস্থাসমূহের মাঝে একমাত্র ইসলামই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে।

---

৫৬. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮।

৫৭. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭।

৫৮. ইমাম আবুস সউদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আহাদী, *তাফসীরে আবিস-সউদ*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরসিল আরাবী, (তা.বি.), পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া দাম্পত্য জীবনে একচেটিয়া অধিকারের সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা নারীদেরকে নানাভাবে মনোকষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিত। ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের এসব জুলুম ও অত্যাচার হতেও উদ্ধার করেছে।

জাহিলী যুগে নারী নির্যাতনের একটি অপকৌশল ছিল এই যে, স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর নারাজ হলে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মূহূর্তে তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই পুনরায় তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। নিজেও তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত রাখত আবার তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। ইসলাম এই অমানবিক অত্যাচার হতে নারীকে মুক্তি দান করেছে। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেনঃ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا-

'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী রেখে দাও অথবা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে ভালভাবে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং জুলুম করার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। আর আল্লাহ্র নির্দেশাবলীকে তোমরা তামাশা ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না।' [৫৯]

জাহিলিয়াতের যুগের নারী নির্যাতনের আর একটি কুপ্রথা হলো অনেক সময়েই স্বামীরা কারণে-অকারণে স্ত্রীর কাছে গমন না করার শপথ করে বসত। কখনও এ শপথের সময় উল্লেখ করত আবার কখনও সময় উল্লেখ করত না। এমনি করে কখনও অনির্দিষ্ট কালের জন্য কখনও সারাজীবনের জন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিত। তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত করত। আবার তালাক দিয়ে অপর স্বামী গ্রহণ করার সুযোগও দিত না। ইসলাম নারীকে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দান করেছে।

---

৫৯. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'যারা স্ত্রীদের কাছে গমন না করার জন্য কসম করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। এরপর তারা যদি মিলমিশ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, আল্লাহ্ তাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি স্ত্রীকে একেবারে পরিত্যাগ করা দৃঢ় সংকল্পই করে থাকে, তাহলে তালাক দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিবে। মহান আল্লাহ্ সব শুনেন ও জানেন।' [৬০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকন্দী (র) বলেনঃ

يعنى الذين يحلفون ان لايجامعوا نساءهم لهم اربعة اشهر بعد اليمين- فان رجعوا عن اليمين وجامعوا نساءهم من قبل ان تمضى اربعة اشهر بعد اليمين وكفروا عن ايمانهم لاتبين المرأة عن الزوج- وان اوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت اربعة اشهر وقعت عليها تطليقة بمضى اربعة اشهر-

'যারা কসম করে যে, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে না, কসমের পর তাদের অবকাশ কাল চার মাস। অতঃপর তারা যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই কসম হতে ফিরে আসে এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয় এবং কসমের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে, তাহলে স্বামী হতে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটবে না। আর তারা যদি স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হয়ে তালাকের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং এভাবে চার মাস চলে যায়, তাহলে তালাক কার্যকর হবে।' [৬১]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, চার মাসের অধিককালের জন্য স্বামী স্ত্রীর কাছে গমন না করে তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারবে না। চার মাস পর সে তাকে গ্রহণ করে নিবে অথবা তালাক দিবে।

---

৬০. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২২৬-২২৭।

৬১. ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকন্দী, *তাফসীরুস্ সমরকন্দী বাহরুল উলূম*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, (তা.বি.), পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-ইসলাম যুগে আরব সমাজে নারী নির্যাতনের আরও দুটি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। একটি হল এই যে, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ বলে মনে করত। তাকে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত এবং তার সম্পদ আত্মসাৎ করত। আর ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরাও তার স্ত্রীকে মহর হিসেবে দেয়া সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সে মহরের সম্পদ নিয়ে চলে যাবে এজন্য তাকে তালাকও দিত না। ইসলাম নারীকে এই উভয় প্রকারের অত্যাচার হতেই মুক্তি দিয়েছে। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَاتَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ-

'হে ঈমানদারগণ, জোর করে নারীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে তোমরা মহর হিসেবে যা দিয়েছ, তার অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখে কষ্ট দিও না।' [৬২]

উত্তম ব্যবহারের অধিকার

জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা ছিল ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার পাত্রী। তাদের সাথে সদাচরণ রাখা তো দূরের কথা, তাদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলাম এ অমানবিক আচরণকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا-

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। কোন কারণে যদি তারা তোমাদের কাছে ভাল নাও লাগে, তাহলে এভাবে চিন্তা কর যে, তোমরা হয়ত এমন একটি বস্তুকে খারাপ মনে করতেছ, যার মধ্যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য মহাকল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' [৬৩]

---

৬২. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১৯।

৬৩. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসেমী (র) বলেনঃ

صاحبوهن بلانصاف فى الفعل والاجمال فى القول حتى لاتكونوا سبب النشوز او سوء الخلق- فلا يحل لكم حينئذ-

'স্ত্রীদের সাথে কাজকর্মে ইনসাফ কর এবং ভাল ও সম্মানজনক কথাবার্তা বলে একত্রে বসবাস কর যেন, তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহ করার অথবা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না বসো। এ ধরনের কোন কিছু করা তোমাদের জন্য আদৌ হালাল নায়।' [৬৪]

স্বামী ও স্ত্রী দু'টি ভিন্ন পরিবারের মানুষ। তারা একত্রিত হয়ে সংসার গড়ে। জীবনব্যাপী এক সাথে বসবাস করে। সময় সময় উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে মনোমালিন্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একজনের কোন আচরণে অপরজনের মন খারাপ হলে, তখন সে যদি মনে মনে এই চিন্তা করে যে, এটাতো ঐব্যক্তির একটি দোষ। তার তো এর অনেক গুণ ও আছে। সেই গুণগুলোর কথা স্মরণ করলেই তাকে ক্ষমা করা সহজ হয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যেই এই মন মানসিকতা থাকলে, সামান্য ভুল বোঝাবোঝির অবসান ঘটবে। ফলে উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হবে। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের সারমর্ম এটাই।

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

ইসলামী শরীয়তে যতগুলো বৈধ কাজ আছে তার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো বিবাহ-বিচ্ছেদ। সুতরাং ইসলাম বিবাহ-বিচ্ছেদকে কখনও উৎসাহিত করে না। একমাত্র অনিবার্য কারণ দেখা দিলে তখন এজন্য শুধু অনুমতি দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য কোন কারণে কখনও মনোমালিন্য হলে, তা উভয়েই সহ্য করে নিবে। সহ্য করা কষ্টকর হলে সমঝোতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করা সম্ভব না হলে উভয়ের অভিভাবকদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দিবে। উভয় পক্ষের অভিভাবকরা তখন স্বামীর পক্ষ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন বিচারক নিযুক্ত করবেন। এই দুই বিচারক নিরপেক্ষভাবে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ জানার চেষ্টা করবেন এবং উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করে দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

---

৬৪. আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাসেমী, *মাহাসিনুত তাবীল, ৪র্থ খন্ড*, করাচীঃ খাদীমী কুতুব খানা, (তা.বি.), পৃ. ১১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا۔

'তোমরা যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশংকা কর, তাহলে তোমরা স্বামীর পক্ষ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক পাঠিয়ে দাও। তারা দু'জনে যদি আন্তরিকতার সাথে স্বামী স্ত্রীর বিরোধের মীমাংসা করতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন এবং সব খবর রাখেন।' [৬৫]

এই দুই বিচারক আপ্রাণ চেষ্টা করেও যদি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম না হন, তাহলে বুঝতে হবে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য। এমতাবস্থায় ইসলাম স্বামীও স্ত্রী উভয়কেই বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারকে তালাক আর স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারকে খুল'আ বলা হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে একমাত্র স্বামীই বিবাহ-বিচ্ছেদের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। এতে স্ত্রীর কোন অধিকারই ছিল না। সাম্যের ধর্ম ইসলাম স্ত্রীকে ও এ অধিকার দিয়েছে। দাম্পত্য জীবন সুখময় ও শান্তি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শরীয়ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই কিছু বিধি-নিষেধ জারী করেছে। তাদেরকে এই বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশও দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের পরিভাষার এই বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশ ও দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের পরিভাষায় এই বিধি-নিষেধগুলোকে حدود الله বা আল্লাহ্র সীমারেখা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন দম্পতির জীবনে যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে সেই সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বামী যেরূপ তালাক দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, স্ত্রীও তেমনি খুল'আর মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম।

---

৬৫. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তালাক হচ্ছে স্বামীর পক্ষ হতে সংঘটিত বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর খুল'আ হয়ে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। সুতরাং তালাকের সময় স্বামী স্ত্রীকে মহর হিসেবে প্রাপ্য সম্পূর্ণ অর্থ এবং ইদ্দতকালের খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় খরচ বহন করতে বাধ্য। আর খুল'আর সময় স্ত্রীকে মহরের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তদুপরি আর কিছু অর্থ-কড়ি স্বামীকে দিতে হবে। [৬৬]

নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

বৈধব্য বা তালাক অথবা খুল'আর কারণে যে মেয়েরা স্বামীহীনা হয়ে পড়ে, ইসলাম তাদেরকে অনতিবিলম্বে পুনরায় বিয়ে দেয়ার জন্য জোর তাকীদ দেয় এবং উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেনঃ

اِنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ-

'তোমরা বিধবা এবং তালাক ও খুল'আ প্রাপ্তা মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও।' [৬৭]

বিধবা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا-

'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, সেই বিধবা মহিলারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত থাকবে।' [৬৮]

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের নির্দেশ হলঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ-

'তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন হায়েয কাল পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত থাকবে।' [৬৯]

---

৬৬. Abdul Hamudah, *The Family Sructure of Islam,* India: American Trust Publications, 1977. P.50. Tanzilur Rahman, *A Code of Muslim Personal Law,* karachi: Hamdard Academy, 1978, P. 94-101. Asaf A.A. Fayezi, *Outlines of Muhammadan law,* Second Edition. London: Oxford University Press, 1955. P. 112-13.

৬৭. আল কুর'আন, সূরা নূর, আয়াত-৩২।

৬৮. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৪।

৬৯. আল কুর'আন, সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা দারিয়াবাদী (র) বলেনঃ

'স্ত্রীর জন্য এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হিকমত, রহস্য ও স্বার্থ- কুশলতা নিহিত রয়েছে। একদিকে স্বামী ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়।' [৭০]

আর বেশি বয়স্কা, অল্প বয়স্কা এবং গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ-

'বয়স বেশী হওয়ার কারণে যে মহিলাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সন্দেহ নিরসনের জন্য তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর অল্প বয়সের দরুন যে মেয়েদের হায়েয শুরুই হয় নি, তাদের ইদ্দত ও তিন মাস। আর গর্ভবতী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব কাল পর্যন্ত।' [৭১]

এই আয়াতগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তাদের জন্য নির্ধারিত ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ে করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদের সামনে আর কোন বাধা নেই। অতএব, নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র আবকাশও নেই।

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতার অধিকার

জাহিলিয়াতের যামানায় আরব সমাজের অনেকেই নিজেদের কাছে পালিতা ইয়াতীম মেয়েদেকে তাদের ধন-সম্পদ এবং রূপ-লাবণ্য দেখে বিয়ে করত। কিন্তু তাদের প্রতি ইনসাফ করত না, ভাল ব্যবহার করত না এবং স্ত্রীর অধিকারও দিত না। ইসলাম ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি এ দুর্ব্যবহার প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিল যে, তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদেরকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে না পার এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করো না। বরং তোমাদের পছন্দমত অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে কর। তাহলে তাদেরকে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দেয়া তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

---

৭০. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক), *তাফসীরে মাজেদী*, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪৪।

৭১. আল কুর'আন, সূরা তালাক, আয়াত-৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবার অনেকেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করত না। তাদের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ করত না। একাধিক স্ত্রীর প্রতি এ দুর্ব্যবহার প্রতিরোধ কল্পে ইসলাম নির্দেশ দিল যে, তোমরা যদি একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করতে না পার তবে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ কর। তাহলে তোমরা একাধিক স্ত্রীর প্রতি বে-ইনসাফী করার অপরাধ হতে মুক্তি পাবে।

এ দু'টি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّتَعُوْلُوْا۔

'তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তাহলে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুজন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে করতে পার। আবার যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সুবিচার রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা কর তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের অধিকারে দাসী হিসেব যে সব মেয়ে আছে তাদের বিয়ে করো। এটাই হবে কারও প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে অন্যদের প্রতি জুলুম না করার জন্য সবচেয়ে বেশী অনুকূল ব্যবস্থা।' [৭২]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলাউদ্দীন (র) বলেনঃ

(فان خفتم) يعنى فان خشيتم وقيل فان علمتم (الاتعدلوا) يعنى بين الازواج الاربع-(فواحدة) يعنى فانكحوا واحدة –

'তোমরা যদি আশঙ্কা কর অথবা যদি বুঝতে পার যে, চারজন স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন মহিলাকে বিয়ে কর।' [৭৩]

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা ও সুবিচার রক্ষার তাৎপর্য হলো সকলের প্রতি সমান খেয়াল রাখা, সমান যত্ন নেয়া এবং মৌলিক দাবিগুলো যথাযথভাবে পূরণ করা। আর এ সব করতে হবে আদল ও ইনসাফের সাথে।

---

৭২. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-৩।

৭৩. আল্লামা আলাউদ্দীন, *তাফসীরুল খাযেন*, ১ম খন্ড,বৈরুতঃ দারুল মারেফা, ২০০২, পৃ. ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য দাবিগুলো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বৈষয়িক আরেক শ্রেণীর দাবি আত্মিক। বৈষয়িক দাবিগুলো হলো খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, রাত্রিযাপন ইত্যাদি। আর আত্মিক দাবি হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা, হৃদয়ের টান ইত্যাদি। বৈষয়িক দাবীগুলোর ব্যাপারে সমতা ও ইনসাফ রক্ষ করা সম্ভব। কারণ এগুলো বাহ্যিক বিষয়াদির সথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আত্মিক দবিগুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ মাত্রায় সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর মানুষের হৃদয় তো আল্লাহ্‌র হাতে। এর উপর মানুষের হাত নেই।

বৈষয়িক দাবিগুলোর ব্যাপারে আদল রক্ষা সম্পর্কে মুসলিম মানীষীগণ বলেনঃ

العدل المشروط هو العدل المادى فى المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه العدل۔

'একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে যেসব বিষয়ে আদল রক্ষা করা শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে বাসস্থান, পোশাক, খাদ্য, পানীয়, রাতযাপন এবং দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন সব বিষয়ে যাতে আদল ও ইনসাফ রক্ষা করা সম্ভব।' [৭৪]

আর মানসিক দাবিগুলো পূরণ করতে পূর্ণমাত্রায় সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা যে কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔

'তোমরা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, এ ব্যাপারে যত প্রবল কামনা ও ইচ্ছাই পোষণ করো না কেন। তবে তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি এমনভাবে পূর্ণমাত্রায় ঝুঁকে পড়বে না, যাতে অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে হয়। তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন।' [৭৫]

---

৭৪. ডঃ মুস্তফা-আস্‌সিবায়ী, *আল মারআতু বায়নাল ফিকহে ওয়াল কানূন*, আলেপ্পোঃ আল মাক্‌তাবাতুল আরাবিয়াহ, ১৯৬২, পৃ. ৯৮।

৭৫. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেনঃ

ولن تستطيعوا ايها الرجال ان تسووا بين نسا نكم فى حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن فى ذلك – لان ذلك لاتملكونه ولو حرصتم فى تسويتكم بينهن فى ذلك-

'হে পুরুষগণ! তোমরা তোমাদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যে তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তোমরা তো এ জিনিসের মালিক নও। সুতরাং যত বেশি ইচ্ছা ও কামনাই পোষণ কর না কেন, তাদের মধ্যে তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না।' [৭৬]

মোটকথা একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী স্বামীর জন্য স্ত্রীদের মধ্যে বৈষয়িক দাবিগুলো পূরণে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্য করণীয়। এ প্রসঙ্গেই প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আদল' এর ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী (র) বলেনঃ

معناه القسم بين الزوجات والتسوية فى حقوق النكاح وهوفرض-

এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রীদের মাঝে রাত ভাগ করে দেয়া এবং বিয়েজনিত অধিকারসমূহ আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা। আর এটাই হচ্ছে ফরয। [৭৭]

অতএব বোঝা গেল, যে ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, ইসলামী শরীয়ত তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

অভিন্ন আইনের অধিকার

প্রাচীন ধর্মগুলো নর-নারীকে সমান মর্যাদা দেয় নি। সেসব ধর্ম নর ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু ইসলাম তা করে নি। সে নর ও নারীকে সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য এক ও অভিন্ন আইন রচনা করেছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং ফরমাবরদারী করার প্রতিশ্রুতি শুধু নর কিংবা শুধু নারী দিয়েছিল না। বরং গোটা মানবকুল তথা নর ও নারী উভয়েই দিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌র দরবারে নর ও নারী উভয়কেই সে প্রতিশ্রুতি পালনের প্রমাণ দিতে হবে।

---

৭৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২৪১।

৭৭. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল আল কুর'আন*, ১ম খন্ড, পৃ.৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, অভ্যাস, নৈতিকতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের কোন ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করে নি। মর্যাদার দিক দিয়েও মানবজাতিকে নর ও নারী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় নি। নর ও নারীর কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন এবং জবাবদিহিতে উভয়েই সমান। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا۔

'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারীর ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন, তখন সে ব্যাপারে কারোরই আর কোন এখতিয়ার থাকে না। এদের মধ্যে যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে-ই স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত হবে।' [৭৮]

ইসলামে নর ও নারীর জন্য আইন যেহেতু এক ও অভিন্ন, তাই পুরুষ কোন অপরাধ করলে সেজন্য তাকে যে শাস্তি দেয়া হবে, একই অপরাধ কোন মহিলা করলেও তাকে ঠিক অনুরূপ শাস্তিই দেয়া হবে। মহিলা বলে তাকে কম বা বেশী শাস্তি দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۔

'ব্যভিচারিণী মহিলা এবং ব্যভিচারী পুরুষ এদের প্রত্যেককেই তোমরা একশত করে চাবুক মার।' [৭৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইউসুফ আলী (র) বলেনঃ

Zina includes sexual intercourse between an man and a woman not married to each other. It therefore applies both to adultery and to fornication. The law of marriage and divorce is made easy in Islam, so that there may be less temptation for intercourse outside well-defined incidents of marriage. This makes for greater self-respect for both man and woman, other sex offences are also punishable, but this section applies strictly to Zina as above defined.

---

৭৮. আল কুর'আন, সূরা আহযাব, আয়াত-৩৬।

৭৯. আল কুর'আন, সূরা নূর, আয়াত-২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ , পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, এরূপ একজন পুরুষ ও মহিলার যৌন মিলনের নাম যিনা। অতএব, যিনা দ্বারা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর সাথে অথবা স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক এবং অবিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক উভয়কেই বুঝায়। ইসলামে বিবাহ ও তালাকের আইন অতি সহজ। ফলে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কামনা-বাসনা খুব কম। এতে নর ও নারী উভয়েরই আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য যৌন অপরাধও শাস্তিযোগ্য। তবে এখানে কেবল যিনার কথাই বলা হয়েছে। [৮০]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'পুরুষ চোর আর নারী চোর, তোমরা উভয়ের হাত কোটে দাও, তাদের কৃতকার্যের শাস্তি হিসেবে। এ সাজা আল্লাহ্র পক্ষে থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী এবং মহাজ্ঞানী।' [৮১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ-وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ-

'মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে। আর মু'মিনা মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে।' [৮২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইউসুফ আলী (র) বলেনঃ

The rule of modesty applies to man as well as woman. A brazen stare by a man at a woman is a breach of refined manners. Where sex is concered, modesty is not only to guard the weaker sex but also to guard the stronger sex. The need of modesty is the same in both men and women.

---

৮০. Allama Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran,* Op. Cit. P. 896.

৮১. আল কুর'আন, সূরা মায়িদা, আয়াত-৩৮।

৮২. আল কুর'আন, সূরা নূর, আয়াত-৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ , শালীনতার বিধান নর ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। কোন মহিলার প্রতি একজন পুরুষের নির্লজ্জ চাহনি মার্জিত ও ভদ্রতার পরিপন্থী। যৌন বিষয়ে কেবল দুর্বলতরকে সংরক্ষনের নাম শালীনতা নয় বরং সবলতরকে সংযত রাখাও শালীনতা। নর ও নারী উভয়ের জন্যই শালীনতার প্রয়োজনীয়তা সমান। [৮৩]

ধর্মীয় কর্মের পুরস্কারে সাম্যের অধিকার

ইসলাম ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। মহান আল্লাহ্ কোনরূপ বৈষম্য না করে নর ও নারীকে সৎকাজ করতে আদেশ করেছেন এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। পুরুষের মত নারীরও ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে বেহেশতে প্রবেশের সমান অধিকার আছে। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে মতবাদ নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে হেয় গণ্য করে, তাকে মানুষের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয় এবং পুরুষকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে মর্যাদা দিয়ে থাকে, ইসলামের দৃষ্টিতে সে মাতবাদ ভ্রান্ত। কোন পুরুষ কোন একটি ভাল কাজ করলে তার জন্য সে পুরস্কার পাবে। আর কোন মন্দ কাজ করলে তার জন্য শাস্তি পাবে। ঠিক তেমনি কোন মহিলা যদি কোন ভাল কাজ করে সে তার জন্য পুরস্কার পাবে আর যদি কোন মন্দ কাজ করে তার জন্য শাস্তি পাবে। এ ব্যাপারে নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না। মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে এ সত্য তুলে ধরেছেন। তিনি নর ও নারী কারও কোন আমল নষ্ট করেন না। কারও পুরস্কার বা শাস্তি কমও করেন না এবং বেশিও করেন না। একই কাজের জন্য উভয়কেই সমান পুরস্কার বা সমান শাস্তি প্রদান করবেন। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۔

'যে ব্যক্তি ঈমানদার হবে এবং সৎকাজ করবে, নরই হোক অথবা নারীই হোক, তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের কারও প্রতি অণু পরিমাণও অবিচার করা হবে না।' [৮৪]

---

৮৩. Allama Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran,* Op. Cit. P. 904.

৮৪. আল কুর'আন, সূরা নিসা, আয়াত-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

'যে ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে কোন সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করার সুযোগ দেব এবং নেক আমলের জন্য তাদেরকে অবশ্যই উত্তম প্রতিফল দান করব।' [৮৫]

৮৫. আল কুর'আন, *সূরা নাহল, আয়াত*-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২ নারী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আল হাদীস

পূর্বে আল কুরআনের আলোকে নারী স্বাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নারী স্বাধিকার সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে শুধু হাদীসের আলোকে। মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদে বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের অধিকার বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ও সমর্থনে নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগন যা বলেছেন এবং সমর্থন করেছেন এখানে কেবল তাই বর্ণনা করা হবে।

কন্যা সন্তানদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জাহিলী যুগে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও শোচনীয়। কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিল না। অনেক নিষ্ঠুর পিতাই নিজের ঔরসজাত কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিত। রাসূলে করীম (সাঃ) এ নিষ্ঠুর প্রথাকে সর্বপ্রথমেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেনঃ

ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات۔

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মাতাদের অবাধ্য হওয়া, মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া এবং হকদারদের হক না দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন।' [৮৬]

আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবী করীম (সাঃ) এর মুখে এই কঠোর বাণী শোনার সাথে সাথে মেয়েদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়ার ঘৃণ্য প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হলো। এভাবে কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকার অধিকার সুনিশ্চিত হলো।

আরব সমাজে আরও একটি কুপ্রথা ছিল যে, কোন কোন পিতা কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকতে দিলেও তাদেরকে লাঞ্ছনা, গঞ্ছনা এবং আবমাননার সাথে এবং নেহায়েত তাচ্ছিল্যের সাথে লালন-পালন করত। পুত্র সন্তানদের তারা মেয়েদের উপর প্রাধান্য দিত। তাদের এ অবৈধ আচরণকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য নবী করীম (সাঃ) ঘোষনা করলেনঃ

من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوثر ولده الذكور عليها ادخله الله الجنة۔

---

৮৬. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, (রঃ), (অনুবাদঃ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈ বুখারী আল জুফী), *সহীহুল বুখারী*, ২য় খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৮৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, সে তাকে জ্যান্ত কবর দেয় না, তার সাথে অপমানসূচক ব্যবহার করে না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয় না, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন।' [৮৭]

রাসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেনঃ

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيا مة انا و هو هكذا وضم اصابعه۔

'যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে লালন-পালন করে বড় করে এবং প্রতিষ্ঠিত করে, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এরূপ পাশাপাশি থাকবো। এ কথা বলে তিনি হাতের অঙ্গুলিগুলো মিলিত করে দেখালেন।' [৮৮]

শুধু মেয়ে নয় বোনদেরকেও লালন-পালন করার জন্য উৎসাহ এবং এজন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

من عال ثلث بنات اومثلهن من الاخوات فادبهن و رحمهن حتى يغنيهن الله اوجب له الجنة۔

'যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা অনুরূপ তিনটি বোনকে লালনপালন করে, তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেন।'

فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او اثنتين قال اثنتين حتى لو قالوا او واحدة فقال واحدة۔

'অতঃপর এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু'জন হয়। নবী (সাঃ) বললেন, দু'জন হলেও। এমনকি লোকেরা যদি বলতো মাত্র একজন হলে, তাহলে তিনিও বলতেনঃ একজন হলেও তা-ই।' [৮৯]

---

৮৭. ইমাম আবু দাউদ, (অনুবাদঃ ডঃ আ.ফ.ম আবূ বকর সিদ্দীক), *দাউদ শরীফ ৪র্থ খন্ড*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ৩৩৭।

৮৮. ইমাম মুসলিম, (অনুবাদঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী রঃ), *সহীহ মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুল বিরর ওয়াস সিলাহ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ পৃ. ৩৩০।

৮৯. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ*, ৩য় খন্ড, মিশরঃ মুয়াস্সাসাহ, কুরতবা, (তা. বি.), পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত জাবির (রা)-এর পিতা তাঁকে বললেনঃ বৎস, এই যুদ্ধেই হয়ত আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মূহূর্তে আমি তোমাকে আমার মেয়েদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার ওসিয়ত করছি।

সুতরাং হযরত জাবির(রা) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তার বোনদের দেখাশোনার জন্য একজন বিধবা মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একজন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ

يا رسول الله ان ابى قتل يوم احد وترك تسع بنات كن لى تسع اخوات فكرهت ان اجمع اليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت-

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অর্থাৎ আমার নয়টি বোন আছে । তাদের দেখাশোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ কুমারী বিয়ে করা পছন্দ করি নি। কাজেই এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি যে তাদের চুল চিরুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। নবী (সাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ।' [৯০]

বিবাহে মেয়েদের মতামত দানের অধিকার

জাহিলী যুগে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতামত ব্যক্ত করার কোন অধিকারই ছিল না। অভিভাবকরা নিজেদের ইচ্ছামত মেয়েদের বিয়ে দিত। রাসূলে করীম (সাঃ) এ প্রথা রহিত করলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, বালেগা যে কোন মেয়েকে তার মতামত না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ

لاتنكح الايم حتى تستامر ولاتنكح البكر حتى تستاذن قالوا يارسول الله كيف اذنها قال ان تسكت-

---

৯০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাকিম, *মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল আলামিয়া, ২০০২, পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

'পূর্বে বিবাহিতা অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত কোন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া যাবে। আর কোন কুমারী মেয়েরও বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর চুপ থাকাই তার অনুমতি।' [৯১]

রাসূলে করীম আরও বলেনঃ

الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى نفسها واذنها صماتها وفى رواية قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها ابوها فى نفسها واذنها صمتها-

'পূর্বে বিবাবিহতা মেয়েরা নিজেদের বিয়েতে মতামত দেয়ার ব্যাপারে তাদের অভিভাবক অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখে। আর কুমারী মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হবে। তবে চুপ থাকাই তাদের অনুমতি। রাসূলে করীম (সাঃ) অন্য একটি বর্ণনায় বলেনঃ পূর্বে বিবাহিতা কোন মেয়ে নিজের বিয়ের ব্যাপারে মতামত প্রদানে তার অলীর চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। আর কোন কুমারী মেয়ের বিয়ের সময় তার পিতা তার মত জানতে চাইবে। তবে সে চুপ করে থাকলেই সেটা তার অনুমতি বুঝতে হবে।' [৯২]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলেনঃ

انها احق اى شريكة فى الحق بمعنى انها لا تجبر وهى ايضا احق فى تعيين الزوج-

'পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে মত জানাবার ব্যাপারে বেশী অধিকার সম্পন্ন। এ কথার অর্থ এই যে, মত জানানোর অধিকারে সেও শরীক রয়েছে। সুতরাং কোন বিয়েতে রাযী হওয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। আর স্বামী নির্বাচনে সেই সবচেয়ে বেশী অধিকারী।' [৯৩]

---

৯১. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, *২য় খন্ড*, *কিতাবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭১।

৯২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, *১ম খন্ড*, *কিতাবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।

৯৩. ইমাম নববী, *শারহু মুসলিম*, *১ম খন্ড*, বৈরুতঃ দারুত তাকওয়া, ২০০৪, পৃ. ৪৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ইয়াতীম মেয়ের বিয়ের সময় ও তার মতামত নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ

لاتنكح اليتيمة الا باذنها-

'কোন ইয়াতীম মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না।' [৯৪]

তিনি আরও বলেছেনঃ

اليتيمة تستامر فى نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها-

'ইয়াতীমা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার নিকট হতে সুস্পষ্ট আদেশ পেতে হবে। তবে সে চুপ থাকলে বুঝতে হবে এটাই তার অনুমতি। আর অঙ্গীকার করলে তাকে জোর করে বাধ্য করা যাবে না।' [৯৫]

মহরের অধিকার

জাহিলী সমাজে মহরের কোন গুরুত্ব ছিল না। নামমাত্র মহরের কিছু প্রচলন থাকলেও এতে স্ত্রীদের কোন অধিকার ছিল না। মহেরর নামে কিছু অর্থকড়ি আদায় হলেও তা অভিভাবকরাই আত্মসাৎ করতো। কিন্তু ইসলামে বিয়ের সময় স্ত্রীকে মহর প্রদান একটি অবশ্য প্রতিপাল্য শর্ত। ইসলামী শরীয়ত নারীকে মহরের উপর পূর্ণ অধিকার দান করেছে। সে তার ইচ্ছেমত খরচ করবে। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

মহরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج-

'বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো এই যে, তোমরা মহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য অধিকার লাভ করে থাক।' [৯৬]

মহর ধার্য করে তা শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। মহর নির্ধারিত করে মনে মনে তা প্রদান না করার ইচ্ছা পোষণ করলে স্বামীকে শক্ত গুনাহগার হতে হবে।

---

৯৪. দার কুতনী, *সুনান*, ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ আলেমুল কুতুব, ৩৯০হিঃ, পৃ. ২৩১।

৯৫. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ১ম খন্ড, *আবওয়াবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

৯৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* ১ম খন্ড, *কিতাবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

من تزوج امر أة على صداق وهو لاينوى ادائه فهو زان ومن ادان دينا وهو لاينوى قضائه فهو سارق-

'যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, সে একজন ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে কর্জ নেয় আর মনে মনে নিয়ত করে যে তা পরিশোধ করেব না, সে একজন চোর।' [৯৭]

عن علقمه عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيأ ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث - فقام معقل بن سنان الاشجعىفقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امراة منا بمثل ما قضيت - ففرح بها ابن مسعود-

হযরত আলকামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হযরত ইব্নে মাসউদ (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। সেই লোকটি মহর নির্ধারিত না করেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পূর্বেই লোকটি মারা যায়। ঘটনাটি শোনার পর হযরত ইব্নেমাসউদ (রা) বললেনঃ এ বিধবা মহিলা মহরে-মেছেল পাবে। অর্থাৎ তার পরিবারের জন্য মহিলাদের মহরের সমপরিমাণ মহর পাবে। এর কমও নয়, বেশিও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে তার মৃত স্বামীর সম্পদে মীরাসও পাবে। হযরত ইব্নে মাসউদ (রা)-এর এই সিদ্ধান্ত শুনে মা'কাল ইব্নে সিনান আল আশজা'য়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ আমাদের গোত্রের বিরউয়া' বিনতে ওয়াশিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারেও রাসূলে করীম (সাঃ) ঠিক আপনার এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) খুব সন্তুষ্ট হলেন। [৯৮]

---

৯৭. আবু আহমদ আল মুনযিরী, (অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ এমদাদুল্লাহ), *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, ঢাকাঃ ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৩৭৪।

৯৮. ইমাম নাসায়ী, (অনুবাদঃ মাওরানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), *নাসায়ী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, কিতাবুন নিকাহ*. ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর নিকট হতে উত্তম ব্যবহার লাভের অধিকার

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر-

'কোন মু'মিন স্বামী তার মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন একটি অভ্যাস তার পছন্দ নাও হয়, তবে তার মধ্যে এমন আরও অভ্যাস আছে যা তার কাছে অবশ্যই ভাল লাগবে।' [৯৯]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (র) বলেনঃ

فيه الارشاد الى حسن العشرة والنهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من اخلاقها فانها لا تخلو مع ذلك عن امر يرضاه منها-

'এ হাদীসে স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার স্ত্রীর কোন একটা স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুণ সে তার প্রতি খুশি হতে পারবে।' [১০০]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

خير كم خير كم لاهله وانا خير كم لاهلى-

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর জেনে রাখ যে, আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।' [১০১]

হাকিম ইব্নে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা রাসূলে করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت ولاتضرب الوجه ولا تقبح ولاتهجر الافى البيت-

---

৯৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯১।

১০০. আল্লামা শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, ৬ষ্ঠ খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকহ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮৯।

১০১. আবূ আহমদ আল মুনযিরী, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? উত্তরে রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকে খাওয়াবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় পরিধান করাবে। আর স্ত্রীর মুখমন্ডলে কখনো আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে কখনও ঘর থেকে বের করে দিবে না।' [১০২]

রাসূলে করীম (সাঃ) আরও ইরশাদ করেছেনঃ

ماأكرم النساء الاكريموما اهانهن الا لئيم-

'একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নারীদের সম্মান করে না। আর কেবলমাত্র নীচাশয় হীনমনা লোক ছাড়া আর কেউ তাদের অবমাননা করে না।' [১০৩]

খোরপোষের অধিকার

হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত- বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেনঃ

فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسو تهن بالمعروف-

'স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।' [১০৪]

রাসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

الا واستوصوا بالنساء خيرا فان هن عوان عندكم -الاان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا - الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعا مهن -

---

১০২. ইমাম আবু দাউদ, *দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

১০৩. আবদুর রউফ আল মানাভী, *ফায়যুল কাদীর, ৩য় খন্ড*, মিশরঃ আল মাকতাবাতুত্ তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হিঃ, পৃ. ৪৯৬।

১০৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, কিতাবুল হজ্জ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

'হে লোকসকল! তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। কেননা, তারা তো তোমাদের নিকট বন্দীর মত। মনে রেখ, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক তেমন অধিকারই রয়েছে। সাবধান, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের উত্তম ব্যবস্থা করবে।' [১০৫]

স্বামীর ধনসম্পদ হতে খরচ করার অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধন-সম্পদ ব্যয়, ব্যবহার এবং দান-খয়রাত করার অধিকার দিয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ খরচ ও দান করার জন্য স্বামীর অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

اذا نفقت المراة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت و لزوجها اجره بما كسب-

'স্ত্রী যদি স্বামীর খাদ্যদ্রব্য হতে শরীয়ত বিরোধী এবং অহেতুক নয় এমনভাবে ব্যয় করে, তাহলে খরচ করার জন্য সে সওয়াব পাবে আর উপার্জন করার জন্য তার স্বামী সওয়াব পাবে।' [১০৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره-

'স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।' [১০৭]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) একদিন নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

يا رسول الله ليس لى شيئ الاما ادخل على الزبير فهل على جناح ان ارضخ مما يدخل على-

---

১০৫. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ১ম খন্ড, *অবওয়াবুর রিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

১০৬. ইমাম আবু দাউদ, *দাউদ শরীফ*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১০৭. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খন্ড, *কিতাবুন নাফাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭।

Dhaka University Institutional Repository

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! স্বামী যুবাইর আমাকে সংসার খরচ করার বাবদ যা কিছু দেন, তাছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এ থেকে দান খয়রাত হিসেবে কিছু খরচ করলে কি আমার গুনাহ হবে? তখন নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ যা পার দান সাদকা করতে পার, তবে নিজের তহবিলে জমা করে রেখো না, তাহলে আল্লাহ্ ও তোমার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন।' [১০৮]

মুযার কবীলার এক মহিলা রাসূলে করীম (সাঃ) কে বললেন ঃ

يا نبى الله انا كل ابائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم-

হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝাস্বারূপ। এ অবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? এর জবাবে রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ الر طب تاكلنه وتهدينه হ্যাঁ, তোমরা যাবতীয় তাজা খাদ্য খাবে এবং অপরকে হাদিয়া - তোহফা দিবে। [১০৯]

আরও একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره-

'স্ত্রী স্বামীর আদেশ ছাড়াই যা কিছু ব্যয় করে, তার অর্ধেক সওয়াব স্বামী পায়।' [১১০]

ইমাম শাওকানী (র) বলেন, এ সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে,

يجوز للمرأة ان تاكل من مال ابنها وابيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى-

মেয়েদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র এবং স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা এবং অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

১০৯. ইমাম আবু দাউদ, *দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১১০. ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ বন্ধন হতে মুক্তিলাভের অধিকার

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেনঃ

ان امراة ثابت بن قيس اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى خلق ولا د ين ولكنى اكره الكفر فى الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين حديقته- قالت نعم-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة-

'সাবিত ইব্নে কায়েসের স্ত্রী নবী (সাঃ) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সাবিত ইব্নে কায়েসের চরিত্র এবং ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি চাই না যে, তার সাথে ঘর সংসার করতে গিয়ে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তোমার স্বামী তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তাকে তা ফিরিয়ে দিতে রাজী আছ? সে বলল হ্যাঁ, আমি রাজী আছি। তখন রাসূলে করীম (সাঃ) সাবিত ইবনে কায়েসকে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।' [১১১]

عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيأ-

'হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে অর্থাৎ উম্মূল মু'মিনীনদেরকে পূর্ণ ইখতিয়ার দিয়ে বললেন যে, তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র নবীর সহধর্মিনীরূপে থাকতে পার, অথবা ইচ্ছা করলে এ বন্ধন মুক্তও হতে পার। তখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মর্যাদাকে প্রধান্য দিলাম এবং নবীপত্নীরূপে জীবন যাপন করাকেই আমরা চেয়ে নিলাম। আর এ কারণে আমাদের কোনরূপ দোষারোপও করা হয় নি।' [১১২]

---

১১১. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খন্ড, *কিতাবুত তালাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৪।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাওবান (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

ايما امراة سألت زوجها طلاقافى غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة۔

'যে মেয়েলোক কোন দুর্বিষহ কারণ ছাড়াই তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।' [১১৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

المنتزعات والمختلعات هن المنافقات۔

'যে সকল মহিলারা অকারণে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং খুল'আ প্রার্থনা করে, তারা মুনাফিক।' [১১৪]

রাসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেছেনঃ

تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لايحب الذواقين والذواقات۔

'তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা যে সকল পুরুষ ও মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় পুনঃ পুনঃ বিয়ে করে এবং যৌনতৃপ্তির বৈচিত্র্য তালাশ করে, আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন না।' [১১৫]

মহান আল্লাহ্ তালাক এবং খুল'আ এ দু'টি কাজই পছন্দ করেন না। তাঁর কাছে যাবতীয় বৈধ কাজের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হলো নিকৃষ্টতম। কোন দম্পত্তির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে আল্লাহ্ পাকের আরশ কেঁপে উঠে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

ابغض الحلال الى الله الطلاق۔

'হালাল বস্তুসমূহের মধ্যে তালাকই হলো আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ।' [১১৬]

---

১১৩. ইমাম তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, *১ম খন্ড*, *আবওয়াবুত তালাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

১১৪. ইমাম নাসায়ী, *নাসায়ী শরীফ*, *৬ষ্ঠ খন্ড*, *কিতাবুত তালাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১১৫. আবু বকর জাস্সাস, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), *আহকামুল কুরআন*, *৩য় খন্ড*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১৩৩।

১১৬. ইমাম আবু দাউদ, *দাউদ শরীফ*, *২য় খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

কোন নারী যেন বৈধ উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত না হয়, ইসলাম তা নিশ্চিত করাকে জরুরী মনে করে। সুতরাং বৈধব্য, তালাক, অথবা খুল'আর কারণে কোন মহিলা স্বামীহীনা হলে অবিলম্বে তাকে পুনর্বিবাহ দেয়ার জন্য ইসলাম তাগিদ দেয় এবং উৎসাহিত করে। তাই নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর চার খলীফার যুগে অতি সহজেই মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যেত। [১১৭]

মিসওয়ার ইব্নে মাখযাম (র) বর্ণনা করেনঃ

ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفات زوجها بليل فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت۔

'সুবাই'য়া আল আসলামিয়া স্বামীর মৃত্যুর একদিন পর সন্তান প্রসব করেন। নিফাসের অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত হলে তিনি নবী (সা) এর নিকট যান এবং দ্বিতীয় বিয়ের জন্য অনুমতি চান। রাসূলে করীম (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।' [১১৮]

আতিকা বিন্তে যায়েদের বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্র সাথে। বিশেষ কোন কারণে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে তালাক দেয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ অনুসারে আবদুল্লাহ্ স্ত্রীকে তালাক দিলেন। কিন্তু এ কাজের জন্য তার খুব মনস্তাপ ও দুঃখ হয়। কারণ, তিনি আতিকাকে খুব ভালবাসতেন। আবদুল্লাহ্র আগ্রহ দেখে হযরত আবু বকর (রা) অতিকাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য অনুমতি দিলে তিনি তাকে আবার বিয়ে করেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ শহীদ হলেন। এরপর যায়েদ ইব্নে খাত্তাব আতিকাকে বিয়ে করলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত উমর (রা) এবং তারপর হযরত যুবায়ের (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত যুবায়ের (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতিকা নিজেই তা অস্বীকার করেন।

---

১১৭. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, (অনুবাদঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৩৫৫-৫৬।

১১৮. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*. *২য় খন্ড*. *কিতাবুত তালাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২।

Dhaka University Institutional Repository

সুহায়ালা বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিল পর পর চারজন অর্থাৎ হযরত হুযাইফা (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে 'আউফ (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনুল আসওয়াদ এবং শামাখ ইব্নে সাঈদের সাথে।

আবদুল্লাহ্ ইব্নে উবাইয়ের কন্যা জামিলার বিয়ে হয়েছিল হযরত হানযালা (রা)-এর সাথে। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলে সাবিত ইব্নে কায়েস তাঁকে বিয়ে করেন। সাবিতের ইন্তিকালের পর মালিক ইব্নে দুখশাম এবং সর্বশেষে হাবীব ইব্নে লিয়াফ তাকে বিয়ে করেন। আসমা বিন্তে উমায়েসের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত আলী (রা)-এর ভাই হযরত জা'ফর (রা)-এর সাথে। তাঁর ইন্তিকালের পর মালিক ইব্নে দুখশাম এবং সর্বশেষ হাবীব ইব্নে লিয়াফ তাঁকে বিয়ে করেন।

রাসূলে করীম (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীদের দ্বিতীয় বিয়ে দোষণীয় বা অপছন্দনীয় হওয়ার কোন ধারণাই ছিল না। এ কারণে সে যুগে ব্যাপকভাবে নারীদের একের অধিকবার বিয়ে হয়েছে।

মহিলাদের পরামর্শ ও উপদেশ দানের অধিকার

ইসলামী সমাজের লাভ-লোকসান এবং ভালমন্দের ব্যাপারে মুসলিম নারী নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সমাজের উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া এবং সংস্কার ও ধ্বংসের সাথে সে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের কল্যাণ তার নিজের কল্যাণ এবং সমাজের ক্ষতি তার নিজের ক্ষতি, সে যদি সমাজকে কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে তাহলে সে অবশ্যই সমাজকে অকল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করবে। সে কল্যাণকে স্বাগত জানালে অকল্যাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করবে। এটা তার প্রকৃতিগত অধিকার। ইসলামী শরীয়ত জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তাকে তার আবেগ ও অনুভূতি, পছন্দ ও অপছন্দ এবং মতামত প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই তার মতামত দানের অধিকার সর্বতোভাবে স্বীকৃত।

শরীয়ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, বিয়ে, খুল'আ, তালাক ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নারীদের মতামত নিতে হবে। অন্য কেউই তাদের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। [১১৯]

---

১১৯. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

لا تنكح الايم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن-

'পূর্বে বিবাহিতা নারীদেরকে তাদের পরামর্শ না নেয়া পর্যন্ত পুনরায় বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েদেরকে তাদের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না।' [১২০]

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেনঃ

ان الولى لايجبر الثيب ولاالبكر على النكاح فالثيب تستأمر والبكر تستأذن-

'অভিভাবক পূর্বে বিবাহিতা মেয়েকে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবে না। অতএব, পূর্বে বিবাহিতা মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্যে রীতিমত নির্দেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়ের কাছে থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।' [১২১]

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে-

لاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن-

'তোমরা ইয়াতীম মেয়েদেরকে তাদের সাথে পরামর্শ না করে এবং তাদের মতামত না নিয়ে বিয়ে দিও না।' [১২২]

এছাড়া সমষ্টিগত এবং সামাজিক ব্যাপারেও ইসলাম নারীদের নিকট থেকে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দান করেছে। হযরত হাসান বসরী (র) নবী করীম (সাঃ) এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেনঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتشير حتى النساء فيشرن عليه بما يأخذبه-

'রাসূলে করীম (সাঃ) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় তারা এমন মতামত পেশ করত যা তিনি গ্রহণ করতেন।' [১২৩]

---

১২০. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, *২য় খন্ড*, *কিতাবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭১।

১২১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুর কারী*, *২০শ খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

১২২. দারু কুতনী, *সুনান*, *৩য় খন্ড*, *কিতাবুন নিকাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

১২৩. ইব্নে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, *১ম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে নারী ছিল অবহেলিত এবং অধিকার বঞ্চিত। ইসলাম নারীকে দিয়েছে পূর্ণ অধিকার। মহাগ্রন্থ আল কুর'আন ও আল-হাদীস জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারীকে ন্যায্য অধিকার দান করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা মানব জীবনের সকল স্তর ও বিভাগেই নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের কোন পর্যায়েই আর নারীর বঞ্চনা নেই। এখন নারী জাতির কর্তব্য হল এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা, সচেতন হওয়া এবং সব ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেয়া। তারা সচেতন না হলে সমাজের কাছ থেকে তাদের অধিকারসমূহ আদায় করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কেস স্টাডি

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি

এই গবেষণাকর্মটি করতে যেয়ে আমাকে গবেষণার স্বার্থে কয়েকটি নির্মম বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নির্যাতিতদের সরাসরি সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত কেস স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে যার কয়েকটি নিচে তুলে দেওয়া হলো ঃ

সমস্যা (১) নাম জরিনা (ছদ্ম নাম)। বয়স-২৮ বৎসর, বিবাহিত, ঠিকানা ৭৭/২, জুরাইন[১]।

বর্ণনা ঃ

১০-১১-২০০৫ তারিখে বাসা থেকে কাজ করে ফিরতে পথে যাওয়ার সময় কায়সার, লিপন, শাহীন নামের তিন মাস্তান বোনের নাম দিয়ে ওয়াপদার নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর নেশা করিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বাসার সামনে ফেলে যায়। এরপর সে গর্ভবর্তী হয়ে পড়ে। তাকে OCC সেন্টারে আনা হয়। OCC সেন্টারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বাচ্চা রাখা হয়। পূর্ণ ১০মাস পর বাচ্চা হয়। কিছু দিন পর বাচ্চাটি মারা যায়। সুস্থ হয়ে মেয়েটি বাসায় যায়। এব্যাপারে মামলা করা হলে প্রধান আসামীর ৫ বছর জেল হয় অন্য দুজন ছাড়া পায়। তারা মেয়েটিকে হুমকি দিছে হত্যার। এখন সে পূর্ণ বিচারের আশায় ঘুরছে। উল্লেখ্য তার প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিয়ে চলে যায় এ ঘটনার পর। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে।

সমস্যা (২) নাম রুমিয়া (ছদ্ম নাম) বয়স-৩৫, ঠিকানা ঃ ৪২ ই আজিমপুর ঢাকা[২]।

বর্ণনা ঃ

বিয়ে হয় ১৯৯৬ তে। স্বামী কোম্পানীতে চাকুরীরত। যৌথ পরিবার তিন বাচ্চা। স্বামী ভরনপোষণ করতে চায়না। ব্যবসার নাম দিয়ে বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে। বিয়ের সময় কোন যৌতুক নেয়া হয়নি বলে টাকা আনার চাপ দেয়। আর এনিয়ে প্রায়ই নির্যাতন করতে থাকে। বাধ্য হয়ে মেয়েটি কিছু কিছু টাকা এনেও দেয়। তারপরও নির্যাতন থেমে থাকেনা।

১. গবেষক কর্তৃক ২৩/১২/২০০৭ ইং তারিখে সরেজমিন পরিচালিত জরীপ।
২. গবেষক কর্তৃক ২৫/১২/২০০৭ ইং তারিখে সরেজমিন পরিচালিত জরীপ।

Dhaka University Institutional Repository

১বছর কাটার পর অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়িতে চলে আসে। বাচ্চাদেরকে আনতে চাইলে দু মেয়েকে দেয় কিন্তু ছেলেটিকে রেখে দেয়। সাহায্যের জন্য মহিলা অধিদপ্তর এসে মামলা করেন।

সমস্যা (৩) নাম-কল্পনা (ছদ্ম নাম) বয়স-২৭, ঠিকানা বাসা-৭, রোড-৮ বালুর মাঠ, মিরপুর-১২[৩]।

বর্ণনাঃ

বিয়ে হয়েছে ২ বছর ৩ মাস। দুমাস আগে স্বামী ৩,০০০/- টাকা বাবার বাড়ী থেকে এনে দিতে বলে। রাজী না হওয়ায় শাশুড়ী গরম পানি এনে দেয় স্বামী তার গায়ে ঢেলে দেয়। এতে গাল, মুখ, বুক পুড়ে যায়। তারপর হাসপাতালে যেতে চাইলে তাও দেয়া হয়না। অবশেষে পোড়া জায়গা খুব সংখটাপন্ন হলে ১৫/০১/০৭ ইং তারিখে OCC সেন্টারে নিয়ে আসা হয় ৭/৮ দিন থাকার পর সে বাসায় ফিরে যায়।

সমস্যা (৪) নাম-নিতু (ছদ্ম নাম), বয়স-৭, ঠিকানাঃ বংশাল[৪]।

বর্ণনা ঃ

মা-বাবাসহ মেয়েটি বংশাল বস্তিতে থাকে। মা বাসায় কাজ করে। বাবা ছোট ব্যবসা করে। দুজনই বাসা থেকে বের হয়ে গেলে পাশের বস্তির যুবক তাকে ডেকে নেয়। মেয়েটি কিছু বুঝতে না পেরে যায়। কিন্তু তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়। এতে সে চিৎকার করতে থাকলে ছেলেটি পালিয়ে যায়। মেয়েটিকে আশেপাশের লোক জন ও মা বাবার সহায়তায় OCC সেন্টারে নিয়ে আসা হয় ।

৩. গবেষক কর্তৃক ২৬/১২/২০০৭ ইং তারিখে সরেজমিন পরিচালিত জরীপ।
৪. গবেষক কর্তৃক ২৯/১২/২০০৭ ইং তারিখে সরেজমিন পরিচালিত জরীপ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। কিন্তু এসব আন্দোলনের ফলে বিচ্ছিন্ন দু'একটি ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও সামগ্রিকভাবে নারী-শিশু নির্যাতনের ওপর প্রভাব ফেলেনি। নারী-শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন একটা প্রতিবেদনমূলক শ্লোগান। কিন্তু সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মূলতঃ প্রতিযোগিতা ভিত্তিক বা পরস্পর বিরোধী নয়। নারী-পুরুষ বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কতো সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং পূত-পবিত্র হবার কথা। যার ফলে প্রতিবাদ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের আবশ্যকতা দেখা দিলে তার পথও কৌশল নারী নির্যাতনের শ্লোগান বা আন্দোলন নয় বরং সৌহার্দ্য, সমঝোতা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই করা সম্ভব। শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা যাবে না। অন্যদিকে নারী-শিশু নির্যাতন কোনো একতরফা ব্যাপার নয়। নারীকর্তৃক পুরুষকে জ্বালাতন, স্ত্রী পরকীয়া প্রেম, খিটখিটে মেজাজের কারণে, শিশুর প্রতি মা-বাবার অসচেতনতা ও নারী-শিশু নির্যাতন ঘটে থাকে। সুতরাং নারী-শিশু নির্যাতনের উৎসমূলে আঘাত হানা ব্যতীত শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কমনীয় ও সংবেদনশীল মানবিক অনুভূতি এবং গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে পারিবারিক সৌহার্দ্য পুনস্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে মধুর দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের উত্তম উপায়।

বাংলাদেশে নারী-শিশু নির্যাতন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। সমাজের অন্যান্য সমস্যার সাথে রয়েছে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং একক এবং বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবে নারী-শিশু নির্যাতনকে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। নারী-শিশু নির্যাতন সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে যা পরবর্তীতে আলোচিত হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা দূরীকরণ

নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতার কারণেই বেশির ভাগ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে সংবেদনশীল মানবিক গুণাবলী এবং অনুভূতির বিকাশ সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে দেশের বৃহত্তর অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ জনগোষ্ঠী পারিবারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসিকতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

(খ) দারিদ্র্য দূরীকরণ

বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ গণদারিদ্র্য। পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে কেন্দ্র করেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ব্যতীত নারী নির্যাতন সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

(গ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধসেল এর কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৮৬ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল খোলা হয়। এ কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের নারী সমাজ তেমন জ্ঞাত নয়। উপজেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতন সেলের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সেবাগ্রহণে মহিলাদের সচেতন করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে গ্রামীণ নির্যাতিত নারী সমাজ প্রতিরোধ সেলের সাহায্য পেতে সক্ষম হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের ১৯৮৯ এর প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল ২১০২৯ এবং উক্ত সময় পর্যন্ত নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ৫৪৭টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। এই নিষ্পত্তির হার যদি আরো ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করা যায় তাহলে নারী সমাজ নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা পাবে।

(ঘ) অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ

ভিসিআর, সিনেমা এবং ভিডিও ক্লাবসমূহ যাতে বিদেশী কুরুচিসম্পন্ন এবং যৌন-উত্তেজক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সরবরাহ করতে না পারে তার ব্যবস্থাগ্রহণ আবশ্যক।

(ঙ) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার

ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো এক্ষেত্রে গ্রামীন সমাজসেবা প্রকল্পের গোষ্ঠী কেন্দ্র (কমিউনিটি

Dhaka University Institutional Repository

সেন্টার) এবং মাদ্রাসা, ক্লাবগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে। মসজিদের খতীব ও ইমামগণ এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(চ) আন্তর্জাতিক পাচার চক্র দমন

আন্তর্জাতিক চক্রের প্রভাবে নারী ও শিশু পাচারে জড়িতদের কঠোর হস্তে দমন করা যাতে করে দেশে বিদেশে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ এবং পাচারে কেউ এগিয়ে না আসে।

(ছ) আইন প্রয়োগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

নারী নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্তের এবং আইন প্রয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আইন এবং বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সমাধা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে বিচার ব্যবস্থার প্রতি নির্যাতিত মহিলারা আস্থাশীল হয়ে ওঠে।

(জ) উপার্জনে নারীর অংশগ্রহণ

নারী সমাজ পরিবারে এবং সামাজে যাতে উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে মর্যাদাসহ বসবাস করতে পারে তার জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। কর্মহীন এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল জীবন ধারা বজায় রেখে সমাজে নারীর মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, তেমনি নারী নির্যাতন বন্ধ করাও সম্ভব নয়।

(ঝ) নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাব তাদের পরিবারেও সমাজে মর্যাদা হ্রাস করেছে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর গৃহের কাজ অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পারিশ্রমিকহীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের কাজ কম দামী ও অবমূল্যায়িত। তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন। আর এটা সম্ভব হলে সেও পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবদান রাখতে সক্ষম হবে, একই সাথে সে পরিবারের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষমতা পাবে। অর্থনৈতিক অবদান রাখাসহ স্বাধীন মতামত প্রকাশে সক্ষম হলে তার উপর সংঘটিত নির্যাতনের মাত্রা কমে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঞ) প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রচার

ইসলাম শুধু নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানাধিকার মর্যাদায় আসীন করেছে তা নয়, ইসলামে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নতও করা হয়েছে। ইসলামের শাশ্বতবাণী "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত" "নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের অলংকার" এ থেকে পরিবারে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাই এদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের এই সুমহান আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারলে যৌতুক, ভুল ফতোয়াসহ মুসলিম নারীর ওপর সকল প্রকার নির্যাতনই কমে আসবে।

(ট) ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার

ইসলামের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাই অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের এ বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানদান করা সম্ভব হলে নারীর ওপর সকল ধরনের নির্যাতন হ্রাস পাবে।

(ঠ) যৌতুক বন্ধকরণ

আমাদের দেশে বৈবাহিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীই মূলতঃ যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। অথচ আমাদের দেশে যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। যৌতুক বিরোধী আইন পাশ হয়েছে ১৯৮০ সনে। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও যৌতুক আদান-প্রদান ও যৌতুককে কেন্দ্র করে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও গৃহবধু হত্যা বন্ধ হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্রপক্ষ যৌতুক চাচ্ছেন আর পাত্রী পক্ষ তা যোগাচ্ছেন। কেউ যোগাচ্ছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে, কেউ স্বেচ্ছায়, খুব কম ক্ষেত্রেই এই আইন লেনদেনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে যত না আইনের দৃষ্টিতে দেখতে হবে তার চেয়েও বেশি বিবেচনা করতে হবে পরিবর্তিত মানসিকতা দিয়ে। যিনি যৌতুক নিচ্ছেন তাঁকে ভাবতে হবে তাঁরও একটি মেয়ে সন্তান থাকতে পারে। যৌতুক যারা নিচ্ছেন তারা হয়তো সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে তা করছেন কিন্তু যৌতুক দেয়াও যে অপরাধ সেই মানসিকতা ও উপলব্ধিবোধ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ও ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"-গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছে বাংলাদেশের নির্যাতিত নারী ও শিশুদের দু:খ আর যন্ত্রনাকে কেন্দ্র করে। এই সকল নির্যাতিত নারী ও শিশুদের যন্ত্রনা, দু:খ, কষ্টকে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণায় তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করে তোলা এবং নিরসন করাই আমার গবেষণার লক্ষ্য। আর তাই আমি এই গবেষণায় খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি নির্যাতনের স্বরূপ, সংখ্যা এবং প্রতিকারের সম্ভাব্য উপায়সমূহকে।

এ পর্যন্ত যত পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন নারী ও শিশুর অবস্থার যে খুব বেশি উন্নতি হয়েছে তা বলা যায়না। যদিও তুলনামূলক চিত্রের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেখা গেছে অনেক সময়েই আইনগত সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বাধা বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমরা যদি নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিকার করতে চাই তবে আমাদের আজ দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সামগ্রিক ভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ না করলে নারী-শিশু নির্যাতন বন্ধ হতে পারে না। তাই সমাজ থেকে বৈষম্য, অন্যায়, পক্ষপাতিত্ব এবং নৈতিক অবক্ষয় দূর করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করে সমাজ থেকে কুষ্ঠব্যাধির মতো দারিদ্র্যকে রোধ করতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা দিতে হবে।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সকল দেশ ও অঞ্চলের দিকে তাকালে নারী ও শিশু নির্যাতনের যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে শরীর শিউরে ওঠে, চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, আর হৃদয় হয় ভারাক্রান্ত। প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা, উন্নয়ন, সভ্যতা কি তাহলে মানুষকে আরো বর্বর, হিংস্র করে তুলছে? এত যন্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্র ও মতবাদের ভীড়ে মানুষ কি তার মানবতাই হারিয়ে ফেলছে? সম্ভবত তা-ই। কারণ মানুষ যতদিন মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র আর মতবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে হাবুডুবু খাবে ততোদিন সে শুধু বিভ্রান্ত ও বিফল মনোরথ হবে। অতএব মানবজাতিকে আজ শান্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য, সভ্যতা ও অগ্রগতির জন্য, নারী-শিশু নির্যাতনের অস্তিত্বহীন এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ জীবন ও পৃথিবীর জন্য শান্তির শাশ্বত ফল্গুধারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার নিকট ফিরে যেতে হবে। ইসলামই কেবল উপহার দিতে পারে সকল অনাচার, অবিচার অশান্তি, অকল্যাণ ও পঙ্কিলতামুক্ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

পরিশেষে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ অভিসন্দর্ভটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন হিসেবে গৃহীত হবে। সেই সাথে এর পাঠকে ইসলামী শিক্ষায় উজ্জীবিত করে সর্বপ্রকার নির্যাতন বিরোধী পূত-পবিত্র মন মানস তৈরীতে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে।

সবশেষে আল্লাহ মহামহিমের নিকট আমার এই খিদমতটুকু কবুল করার প্রার্থনা করছি, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা ও 'আরবী

* আল কুর'আন।
* অধ্যাপক ফারুক খান, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২ ও এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২*, ঢাকা ঃ ডাইনামিক পাবলিকেসন্স, ২০০২।
* অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, *আল কুরআনে নারী*, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২।
* আইন ও সালিশ কেন্দ্র বুলেটিন-২০০২, ঢাকাঃ ২০০৫।
* আফরোজা আখতার, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-৮, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ২০০৬।
* আওগুষ্ট বেবেল, *নারী-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*, (অনুবাদঃ কনক মুখার্জী), কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৩।
* আবুদ কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা ঃ ১৯৭৩।
* আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, (অনুবাদঃ মাওলানা এ.বি.এম এ খালেক মজুমদার), *মিশকাত শরীফ*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫।
* আল্লামা আবুল কাসেম জারুল্লাহ যামাখশারী, *তাফসীরে আল কাশশাফ*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাত, (তা.বি.)।
* আল্লামা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর, ২য় খন্ড*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর (তা.বি.)।
* আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল মাওয়ারদী, *আন নুকাত ওয়াল উয়ুন-তাফসীরুল মাওয়ারদী, ১ম খন্ড*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, (তা. বি.)।
* আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাসেমী, *মাহাসিনুত তাবীল*, ৪র্থ খন্ড, করাচী ঃ খাদীমী কুতুবখানা, (তা.বি.)।
* আল্লামা আলাউদ্দীন, *তাফসীরুল খাযেন*, বৈরুতঃ দারুল মারেফা, ২০০২।
* আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪র্থ খন্ড, বৈরুত ঃ দারুল কুতুবুল আলামিয়া, ২০০২।
* আবু আহমদ আল মুনযিরী, (অনুবাদ ঃ মাওলানা মোঃ এমদাদুল্লাহ), *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

* আল্লামা শাওকানী, *নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খন্ড,* বৈরুত ঃ দারুল ফিকহ, ১৯৮৩।
* আবদুর রউফ আল মানাভী, *ফায়যুল কাদীর,* ৩য় খন্ড, মিশর ঃ আল মাকতাবা তুত্ তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হিজরী।
* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুরকারী,* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।
* আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ,* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪।
* আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসূল (সাঃ) এর যুগে নারী স্বাধীনতা,* (অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল মনয়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, মাওলানা মুনাওয়ার হোসাইন, ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন, ১৯৯৫।
* ইউনিসেফ, *জাতিসংঘ শিশু সনদ-১৯৮৯,* ঢাকাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১৯৯২।
* ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী, (অনুবাদঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ), *তিরমিযী শরীফ,* ৪র্থ খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।
* ইমাম আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর, (অনুবাদঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক), *তাফসীরুল কুরআনুল-আযীম আফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯।
* ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল ফারা আল বাগাবী, *মা' আলিমুত তানযিল,* ১ম খন্ড, *বৈরুতঃ* মাকতাবাতুল ইলম, (তা. বি.)।
* ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল কুরতবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন,* ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৮।
* ইমাম আবুস সউদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আহাদী, *তাফসীরে আবিস সউদ,* ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরসিল আরাবী, (তা.বি.)।
* ইমাম আবু বকর জাস্সাস, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), *আহকামুল কুরআন,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬।
* ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার,* ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০২।
* ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (তা. বি.)।
* ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র:), (অনুবাদ ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী আল জুফী), *সহীহ বুখারী শরীফ,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

* ইমাম আবু দাউদ, (অনুবাদ ঃ ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক), *দাউদ শরীফ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬।
* ইমাম মুসলিম (অনুবাদ ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী র:), *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।
* ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ*, ৩য় খন্ড, মিশরঃ মুয়াস্ সাসাহ, কুরতবা, (তা.বি.)।
* ইমাম নববী, *শারহু মুসলিম*, ১ম খন্ড, বৈরুত ঃ দারুত তাকওয়া, ২০০৪।
* ইমাম নাসায়ী, (অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) *সুনানে নাসায়ী*, ৬ষ্ঠ খন্ড, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।
* ইয়াসিমিন নূর, *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও কর্তব্য*, ঢাকা, আফতাব প্রেস, ২০০৫।
* উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক রিপোর্ট, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-৫, ঢাকাঃ ২০০৩।
* উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক রিপোর্ট, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-৭, ঢাকা, ২০০৫।
* উইমেন ফর উইমেন-২০০৩, *বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানী মোকাবেলা সংক্রান্ত নীতিমালা (অপ্রকাশিত)।*
* খাদিজা আখতার রেজায়ী, *মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য*, ঢাকা ঃ বারিধারা কুটনীতিক এলাকা, ২০০৩।
* গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৮৩।
* গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।
* জালালুদ্দীন সয়ূতী ও *জালালুদ্দীন মাহাল্লী, তাফসীরুল জালালাইন*, দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, (তা. বি.)।
* তাহমিনা আখতার মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, বাংলা একাডেমী ঃ ১৯৯৫।
* দার কুতনী, সুনান, ৩য় খন্ড, বৈরুত ঃ আলেমূল কুতুব, ৩৯০ হিজরী।
* *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকাঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯১।
* ডঃ মুস্তফা আস্সিবায়ী, *আল মারআতু বায়নাল ফিকহে ওয়াল কানূন*, আলেপ্পো ঃ আল মাক্তাবাতুল আরাবিয়াহ, ১৯৬২।

Dhaka University Institutional Repository

* ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
* নারী পক্ষ, *নারীর জন্য আইন: প্রয়োগও প্রতিবন্ধকতা, নারী সংগঠন সমূহের প্রথম নারী সম্মেলন রিপোর্ট*, ঢাকা ঃ জয়দেবপুর, ২০০৪।
* নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, *মানুষ নিয়ে বেচাকেনা*, ঢাকা ঃ ২০০১।
* নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *শিশু অধিকার ও মহানবী (সাঃ)*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
* ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী, *তাফসীরুস সমরকন্দী বাহরুল উলুম, ১ম খন্ড*, বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, (তা.বি)।
* বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, *বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ২০০৪*, ঢাকা ঃ ২০০৫।
* বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, *বাংলাদেশ নারীর প্রতি সহিংসতা-২০০৫*, ঢাকাঃ ২০০৬।
* বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট, ঢাকাঃ রিসোর্স সেন্টার, ২০০৭।
* বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, *বিলস বুলেটিন*, ঢাকাঃ ২০০০।
* বিচারপতি দেবেশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশে নারী সমাজের স্থিতিসত্তা ও আইনগত অধিকার, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা*, ঢাকাঃ ১৯৯১।
* বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, *ফতোয়ার বলি ছাতকছড়ির নূরজাহান*, ঢাকাঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা উপ-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৭।
* ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মকৌশল, *মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের রিপোর্ট*, অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৫।
* মাহবুবা সুলতানা, *ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-৭*, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ২০০৫।
* মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন, (১ম ও ২য় খন্ড)*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী।
* মালেকা বেগম, *যৌতুকের সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০০৬।
* মোঃ আনছার আলী খান, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

* মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য,* ঢাকাঃ ৩৯, বাংলাবাজার, ১৯৯৬।
* মালেকা বেগম, *মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া স্বদেশী ও স্বাদেশিক,* ঢাকাঃ ২০০৮।
* মওলানা এ.বি. রফিক আহমেদ ও মওলানা মুহাম্মদ মূসা, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
* মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী, *তাফসীরে হাক্কানী, ২য় খন্ড,* নয়াদিল্লীঃ ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, (তা. বি.)।
* মাওলানা মুহাম্মদ আলী হাসান, *কুরআন শরীফ তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ, ১ম খন্ড,* ঢাকাঃ উসমানিয়া বুক ডিপো, (তা.বি.)।
* মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী, *তাফসীরে মা' অরিফুল কুরআন, ২য় খন্ড,* লাহোরঃ মাকতাবাতু উসমানিয়া, ১৯৮২।
* মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনী, *সাফয়াতুত্ তাফসীর, ১ম খন্ড,* তেহরানঃ দারুল ইহসান, (তা.বি.)।
* মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর আযীয, *তাফসীরুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১ম খন্ড,* ঢাকাঃ দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭।
* মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, (অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক), *তাফসীরে মাজেদী, ১ম খন্ড,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।
* মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।
* মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ও এবি রফিক আহমেদ, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা,* ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।
* রওনক জাহান মাহমুদা ইসলাম, *বাংলাদেশে নারী সহিংসতা,* ঢাকাঃ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ২০০৬।
* লেখকমন্ডলী, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫।
* শাইখ তানতাবী জওহারী, *তাফসীরুল জাওয়াহের, ৩য় খন্ড,* বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসির আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯১।
* শাইখ আহমাদ জৌনপুরী, *আত তাফসীরুল আহমাদিয়া,* পেশওয়ারঃ মাকতাবা-ই-হাক্কানিয়া, (তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

* শাহ আবদুল হান্নান, *নারী ও বাস্তবতা,* ঢাকা ঃ এ্যাডার্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২।
* সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের,* ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০১।
* সালমা খান কর্তৃক পঠিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার, মে ৩০ ও জুন ১,১৯৯৪, ঢাকা।
* সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারকগ্রন্থ,* ঢাকাঃ বুলবুলি পাবলিশিং হাউজ, ২০০২।
* সাইয়েদ জালালুদিন আনসার উমরী, (অনুবাদঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), *ইসলামী সমাজে নারী,* ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১।
* সৈয়দ শাহজাহান, *ধর্ম ও নারী,* ঢাকাঃ গতিধারা প্রকাশনা, ২০০১।
* হামিদা আখতার খানম, *বাংলাদেশে মেয়েদের আত্মহত্যা,* ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন, ২০০৫।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা), *তানবীরুল মিকরাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস,* করাচী ঃ খাদীমী কুতুবখানা, (তা. বি.)।

ইংরেজী

* Ain-o-shalish kendra 2000. *Safety and health regulation in Garment Factories in Bangladesh,* Dhaka: ASK, 2001.
* Allama Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran,* U.S.A. Amana corp, 1983.
* Abdul Hamudah, *The family structure of Islam,* India: American trust publications, 1977.
* Asaf A.A. Fayezi, *Out lines of Muhammadan Law,* Second Edition, London: oxford University press, 1955.
* Kening & Ryan, *Sexual Harassment of working women. A case of sex Discrihination,* Yale University press: New Haven cann.
* Tanzilur Rahamn, *A code of Muslim personal law,* karachi: Hamdard Academy, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

* Translated by Maleka Begum, *Report of the Forth world conference on women, United Nations, Beijing-1995, section. on D: Violance Against women,* Dhaka: The Royal Danish Embassy, 1997.
* Farley, L (1978): Sexual Shakedown: *Sexual Harassment of women on the job, melabourne house,* London/MC, Graw-Hill, New york.
* Md. Rabiul Islam, *Recent ftends and consequines of rape in Bangladesh.* A study on *violence against women and adorescent girls,* Social Science Journal, Faculty of social science. University of Rajshahi, Vol 9, July 2004.
* Maulana Muhammad Ali, *The Holy Quran,* United states: American trust publications.
* Ralph c carriere, *Violence Against Women: Analysis & Action,* UNICEF representative in Dhaka at the National workshop on Eliminating violence against women, CIRDAP, Dhaka: Sep. 1996.

পত্র পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১.০১.১৯৯৩।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫.০৮.১৯৯৫।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৪.১২.২০০১।
দৈনিক প্রথম আলো, ০৫.০৬.২০০৩।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৬.০১.২০০৩।
দৈনিক দি ডেইলি ষ্টার ০৪.০৬.২০০৩।
দৈনিক দিনকাল, ০৭.০৪.২০০৩।
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০.০১.২০০৪।
দৈনিক প্রথম আলো, ০৬.০৬.২০০৫।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৭.০২.২০০৭।
দৈনিক প্রথম আলো, ১০.০৫.২০০৭।
দৈনিক প্রথম আলো, ২৭.০২.২০০৭।
দৈনিক প্রথম আলো, ১০.০৫.২০০৭।
দৈনিক জনকণ্ঠ ০৩.০৪.২০০৭।
দৈনিক জনকণ্ঠ ০৭.০৪.২০০৭।
দৈনিক জনকণ্ঠ ১০.০৪.২০০৭।